নীলকণ্ঠ

নীলকণ্ঠ/দুলেন্দ্র ভৌমিক

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

- প্রথম মুদ্রণ : বাংলা নববর্ষ, বৈশাখ '৭১ / এপ্রিল '৬৪
- প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯
- মুদ্রাকর : নিমাই চন্দ্র ঘোষ। দি রঘুনাথ প্রিন্টার্স
  ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৭০০০০৬
- প্রচ্ছদ : অনুপ রায়....

'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হল। লেখক হিসাবে এজন্য পাঠক-পাঠিকাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। পাঠক-পাঠিকাদের ভালবাসাই যে কোন লেখকের কাছে শ্রেষ্ঠ উপহার এবং পরম প্রাপ্তি। এই উপন্যাসটি কেমন করে কী ভাবে লেখা সে কথা প্রথম মুদ্রণের ভূমিকায় বলেছি। 'নীলকণ্ঠ'কে অবলম্বন করে বাংলায় একটি ছবি হয়েছে, একটি যাত্রাদলও পালা তৈরি করেছেন। শুনেছি দুটোই ব্যবসায়িক দিক থেকে সফল। 'নীলকণ্ঠ'কে নিয়ে হিন্দিতেও ছবি তৈরি হবার কথা। এই ঘটনাগুলো উপন্যাসটির জনপ্রিয়তারই সাক্ষ্য। আমার নিজের শুধু ভাল লাগে এই ভেবে যে, আমার উপন্যাসটি পাঠক-পাঠিকাদের ভালো লেগেছে। তাঁদের ভালো লাগাই আমার পরিশ্রমের পুরস্কার।

বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে টেলিফোনে এবং পত্র দিয়ে জানতে চেয়েছেন 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাসের নায়িকা 'সীতা' সম্পূর্ণই কাল্পনিক কি না। কিছুটা কল্পনা তো আছেই। সবটাই কল্পনা করে সাজিয়ে লেখার মতো দক্ষ লেখক আমি নই। কোন এক সীতাকে আমি একদা চিনতাম। আজ সে কোথায় কিংবা এই লেখা সে পড়েছে কিনা তা আমি জানি না। বহুকাল তার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। কেন জানি না, আজ, এই মুহূর্তে তাকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে।

বিনীত

দুলেন্দ্র ভৌমিক

বেহালা, ২৪ পরগণা

সমরেশ মজুমদার

ও

অসীম চক্রবর্তী

আমার দুই বন্ধুকে

অন্ধকার আকাশের নিচে আস্তে আস্তে আলো ফুটে উঠছিল।

যতীন খোলা জানালার বাইরে থেকে চোখ গুটিয়ে আনল। ঘরের মধ্যে হালকা নীলচে আলোয় নাইলনের মশারী। ভেতরে সন্টু এলোমেলো হয়ে শুয়ে আছে। ভোরের হাওয়ায় একটা ঠাণ্ডা ভাব থাকে। যতীনের হঠাৎ মনে পড়ল, গতকাল সন্ধ্যেবেলা এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, ভোরের হাওয়ায় যেন তারই আর্দ্রতা খুঁজে পেল। জানালার কাছ থেকে সরে মশারীর ভেতরে ঢুকল যতীন। আগোছালো চাদরটা সন্টুর বুক পর্যন্ত টেনে দিয়ে আবার বাইরে এল। আকাশের অন্ধকার একটু একটু করে গলতে শুরু করছে। জানালা দিয়ে আর চাঁদটাকে এখন দেখা যাচ্ছে না। কেবল একটাই নক্ষত্র ম্লান চোখে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

যতীনের বুকের মধ্যে একটা কষ্ট হচ্ছিল। ঘরে চারদিকে তাকিয়ে নিজেকে অন্যমনস্ক করতে চাইল, কিন্তু পারল না। বছরের এই একটা দিনে তার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকা দুঃখের চিতাটা দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। যতীন নিঃশব্দে সেই আগুনে পুড়তে থাকে। একটা বিবর্ণ স্মৃতি অনেক দিনের ওপার থেকে ধীরে ধীরে কাছে আসে। চোখের সামনে, হয়তো চোখ নয়, বুকের কোন গোপন ঘরে সেই স্মৃতিটা দুলতে থাকে। যতীনের সব কথা আস্তে আস্তে মনে পড়ে যেতে থাকে, সব কথার পেছনে গেঁথে থাকা সব ছবিও এখন এই মুহূর্তে স্পষ্ট হয়।

যতীন ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে আবার জানালার সামনে আসে। আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। গোটা পাড়াটা এখনও নিঝুম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আর ঘুম আসেনি যতীনের। ঘুমের মধ্যে সে যেন সেই ডাকটা শুনতে পেয়েছে। অনেকদিন পর তিনসুকিয়ার রেল কোয়ার্টার্স আর শিউপুরের চা বাগানকে স্বপ্নে দেখল যতীন। অথচ ঘুম ভেঙে যেতেই যখন চোখের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল তখন শীতের কুয়াশার মতো তার মন ছেয়ে থাকল

এক গাঢ় বিষণ্নতায়। সেই বিষণ্নতা নিয়ে যতীন বিছানা থেকে উঠে এসেছিল জানালার সামনে। অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ রেখে ভেবেছিল, রাত ফুরিয়ে এসেছে, আজ, হয়তো আর কয়েকঘণ্টা পরেই ওপরের ঘরে সীতার জন্মদিন পালন করা হবে। অথচ এমন একটা স্বপ্ন কেন আজকের রাতেই ফিরে এল! স্বপ্নরা কি বুকের মধ্যে থেকে যায়?

ওপরের ঘরের দরজা খোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। যতীন জানে এবাড়িতে মেজ বৌ উমাই সবার আগে ওঠে। অন্যরা ওঠার আগেই যতীনের বাজার করা হয়ে যায়। সকালের চায়ের পর্ব মিটে যেতেই শুরু হয়ে যায় তাড়াহুড়ো। যেন ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটতে থাকে বাড়ির মানুষগুলো। যতীন দরজা খুলে বারান্দায় এল। বারান্দার বাতিটা সারা রাত জ্বালিয়ে রাখা হয়। রোজ যতীন উঠে সেটা নেভায়। আজ বাতি নেভাতে গিয়ে তার মনে হল, অন্ধকার এখনও কাটেনি, বাতিটা খানিক থাকুক। আকাশে বোধহয় মেঘ জমেছে। পুব আকাশে আলো ফুটি ফুটি করেও ফুটছে না। বড় রাস্তা থেকে গাড়ি চালার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে!

খানিক বাদেই চায়ের পেয়ালা নিয়ে উমা এল। এগুলো রোজকার ব্যাপার। চা খেয়ে যতীন বাজারে যাবে। বাজার থেকে ফিরে এসে সন্টুকে তুলবে। সন্টু তৈরি হয়ে যাবার পর ওকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে যতীন দাড়ি কামাতে বসবে। অনেক দিনের অভ্যাস করা এই রুটিন রোজই এক রকম থাকে। আজ যতীনের মনের মধ্যে এলোমেলো হাওয়া বইছিল। আজকের সকালটা অন্যদিনের মতো নয়! তফাৎটুকু খুব সূক্ষ্ম, শুধু যতীন ছাড়া আর কারো টের পাবার কথা নয়। কিন্তু যতীন জানে, যতক্ষণ সে একা ততক্ষণই তার মনটা এলোমেলো থাকবে, রোজকার অভ্যস্ত জীবনে একবার ঢুকে যেতে পারলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। এরকমই প্রতিবার হয়, আবার আস্তে আস্তে ঠিকও হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি চা শেষ করে যতীন বাজারে যাবার জন্য উঠে পড়ল। কোন একটা কাজের মধ্যে ডুবে যেতে পারলে নিজেকে ঠিক রাখতে

পারবে এই ভেবে যতীন অন্যদিনের চাইতে আগেই বাজারে বেরিয়ে গেল। শূন্য পেয়ালাটা তুলতে তুলতে উমা শুধু একটু অবাক চোখে তার ভাশুরের চলে যাওয়া দেখল।

গলির মধ্যে একটা ট্যাকসী ঢুকছিল। গাড়ির শব্দ আর হেড-লাইটের আলো স্পষ্ট হয়ে উঠতেই উমা দ্রুত জানালার দিকে সরে যেতে যেতে বলল, 'ওই বুঝি বড়দা এলেন।'

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছিল রথীন। কোঁকড়া চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলল, 'বড়দা আসবে ট্যাকসী করে! তোমার কি মাথা খারাপ। বড়দা জীবনে কদিন রিকশা চেপেছে তাও বোধহয় আঙ্গুল গুণে বলা যায়।

চুলের জটে চিরুনি আটকে গিয়েছিল বলে রথীন মুখ কুঁচকে সেই জট ছাড়াতে লাগল। জানালার খড়খড়ি তুলে উমা বাইরে তাকিয়ে গলির মুখটা দেখছিল। এখান থেকে বাইরের গলিটা স্পষ্ট দেখা যায়। একটা ট্যাকসী এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক দরজার সামনে। উমা ওপর থেকে জানালায় দাঁড়িয়ে দেখল ট্যাকসীর দরজা খুলে প্রথমে নেমে এল দীপু তার পেছনে নামলেন ছোট জামাইবাবু। জানালার কাছ থেকে সরে আসতেই রমা জিজ্ঞেস করল, 'কে এল রে মেজ?'

উমা এবাড়ির মেজ বৌ। সেই সুবাদেই ননদরা ওকে মেজ বলে ডাকে। ডাকের ধরনটাও সেই সাবেকীকালের মতো। উমা বড় ননদের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার কর্তা আর দীপু।'

রথীন কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই হৈ হৈ করে এসে পড়ল দীপু আর জামাইবাবু। পাশের ঘরে যারা এতক্ষণ অন্য কাজে আটকে ছিল তারাও এবার বড় ঘরে চলে এল। খানিক আগেও যা ছিল অনাড়ম্বর নিঃশব্দ একটি আয়োজন মুহূর্তেই তা বাদলেগিয়ে একটা ছোটখাট উৎসবের চেহারা নিচ্ছিল। রথীন সিগারেটের প্যাকেটটা বড় জামাইবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'অজিতদা, বড়দা আসবার আগে একটু টেনে নাও।'

সিগারেট দাঁতে চেপে ধরে অজিত বলল, 'কিন্তু বড়দা না এলে তো কিচ্ছু জমছে না। আমাকে তো টেলিফোনে তাড়া লাগিয়েছিল যেন সকাল সকাল চলে আসি।

'খাটের কোনে বসে নিজের জন্য পান সাজছিল রমা। এবার খিলিটা মুখে পুরে দিয়ে বলল, 'বড়দার জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে থেকে লাভ নেই। আমাদের তো ফিরতে হবে।'

কৌটো থেকে আঙুলের টিপে করে জর্দা তুলে রমা হাঁ করল। অজিত একবার নিজের স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিয়ে রথীনকে বলল, 'কিন্তু বড়দা না এলে আমরা করবোটা কি?'

রথীন জবাব দিলনা। সে শুধু রমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। পানের রস গিলতে গিয়ে বিষম খেয়েছিল রমা, তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারল না। একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বড়দার সবটাতেই বাড়াবাড়ি আর আদিখ্যেতা। কি আর হাতি-ঘোড়া করবে। জন্মদিনের অনুষ্ঠান, তাই ফটোতে মালা-টালা দাও, ধূপকাঠি জ্বালাও-এইসব কর আর কি!

রমার কথা বলার ধরনটা রথীনের ভালো লাগল না। বড়দা সামনে থাকলে ও নিশ্চয়ই এভাবে কথাটা বলতে পারত না। মেজ বৌ উমাও তার ননদের দিকে তাকিয়ে ছিল। রথীন উমার দিকে তাকিয়ে ওর মনের ভেতরটা দেখতে পেল যেন। রথীন দেখল, দেওয়ালের হুক থেকে দিদির ছবিটা নামিয়ে এনে আঁচলদিয়ে ছবিটা মুছছে উমা। হলদে হয়ে আসা বিবর্ণ একটা কিশোরীর ছবি। বুকের ওপর দুটো লম্বা বিনুনী ঝোলানো। পরণের শাড়িটাকে আজ আর ছবি থেকে দেখে চেনা যায় না। বড়দা বলেছিল, প্রতিবারই জন্মদিনে কথাটা বলে, সীতা তখন সবে ফ্রক ছেড়ে শাড়িপরতে শিখছে। সেবার পুজোয় বাড়িতে একজোড়া শাড়ি এনেছিলেন বাবা। একটা মার, অন্যটা সীতার। সেই প্রথম পুজোর বাজারে একজোড়া শাড়ি কেনা হল। কেননা, মা ছাড়া তখন এবাড়িতে আর মাত্র একজনই মহিলা সে হচ্ছে সীতা, তা সে সীতা পুজোতে ফ্রক পেয়ে আসছিল এতদিন। নতুন শাড়ি হাতে পেয়ে সীতা যেন খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেল।

কিন্তু শাড়ি পরবার পর দেখা গেল ওকে আর ঠিক আগের মতো ছোট্টটি মনে হচ্ছে না। ওর শাড়ি পরা চেহারাটা দিব্যি বড়সড় মেয়ের মতো।

রথীনের ভাসা ভাসা মনে পড়ে তিনসুকিয়ার সেই দিনগুলো। শাড়ি পরার পর থেকে দিদি যেন আস্তে আস্তে বদলে গিয়েছিল। আগের মতো হুটহাট বাইরে যেত না, পেয়ারা গাছে চড়ে ভাইদের ডাকতো না, ওর সমস্ত দস্যিপানা যেন কেমন থিতিয়ে গেল। রথীনের মনে পড়লে এখনও খুব লজ্জা হয়, ভেতরে ভেতরে ঘেমে ওঠে। ছোট-বেলায় কত নিরেট আর আহাম্মক ছিলাম। একবার কী একটা দরকারে দিদির বালিশের তলা হাতড়াতে গিয়ে একটা জিনিস পেয়ে গিয়েছিলাম। দিদি তখন সবে ঘুম থেকে উঠে খোলা চুল আলগা খোঁপা করে বাঁধছিল। রথীন অদ্ভুত সেই জিনিসটা একবার ঘুরিয়ে দেখে জিজ্ঞেস করেছিল, 'দিদি এটা কী রে?'

মুখ ফেরাতে গিয়ে সীতার মুখ সহসা লাল হয়ে গিয়েছিল। এক টানে রথীনের হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে আবার বালিশের নিচে গুঁজে দিতে দিতে বলেছিল, 'ভাগ এখন থেকে না বলে মেয়েদের জিনিসে হাত দিবিনা।'

রথীন তো অবাক! তেমন ভাবেই বলেছিল, 'বারে তুই বুঝি মেয়ে।'

সীতা চোখ পাকিয়ে উঠে বলেছিল, 'মেয়ে নাতো কি ছেলে?'

রথীনের বিস্ময় যেন কাটেনা। সীতার পাশে বসতে বসতে অবাক হওয়া গলায় বলেছিল, 'যা, তুইতো দিদি, মা-তো শুধু মা-ই, ..' রথীনের ব্যাপারটা বোধহয় ধরতে পেরেছিল সীতা। ওর চুলে একটা টোকা দিয়ে বলেছিল, 'তাহলেও আমরা মেয়ে আর তোরা ছেলে।' রথীনের কৌতূহল তখনও থেকে গিয়েছিল। তাই বালিশের তলাটা দেখিয়ে বলেছিল, 'কিন্তু ওটা কি রে?'

সীতা খাটের ওপর থেকে নামতে নামতে বলেছিল, 'ওটা মেয়েদের একটা পোশাক।'

রথীন যেন বিশ্বাস করতে চাইল না। অবিশ্বাসের গলায় বলেছিল

'ধা, ওটাতো তোকে কখনও পরতে দেখিনা।'

সীতা বালিশের তলা থেকে জিনিসটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে বলেছিল, ছেলেরা যে জামাব নিচে স্যাণ্ডো গেঞ্জি পরে তা কি জামার ওপর থেকে বোঝা যায়।'

কথাটা বলে সীতা আর দাঁড়ায় নি। রথীন সেদিন স্পষ্ট করে ব্যাপারটা বোঝেনি, কিন্তু যেদিন বুঝেছিল সেদিন লজ্জায় ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠেছিল।

সীতার বিবর্ণ ছবিটায় উমা চন্দনের টিপ পরিয়ে দিল। রজনী-গন্ধার একটা মালাও আনা হয়েছে। ছবিটা টেবিলে রেখে উমা মালা পরাতে লাগল। রথীন দেখল রমা খাটের ওপর বসে গোটা ব্যবস্থাটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। ওর বাড়ি ফেরার তাড়া আছে বোধহয়। মা'র আগেই ছোটমাসী মারা গিয়েছিলেন। তখন থেকে মা বেঁচে থাকা অবধি রমা এবাড়িতে বড়মাসীর কাছেই থেকেছে। অকালে সীতাকে হারানোর দুঃখটা এবাড়ির সকলের মনের মধ্যেই তুষের আগুনের মতো জেগেছিল। রমাকে নিয়ে সকলে সেই দুঃখটাকে আড়াল করতে চাইতো। বড়দা ছাড়া অন্যান্য ভাইদের কাছে রমা তাই বড় দিদির মতো। সীতার চাইতে দেড় বছরের ছোট। মনে হয় বেঁচে থাকলে সীতাও এখন এইরকম গিন্নি গিন্নী চেহারা পেয়ে যেত। রথীন মনে মনে দিদির হারানো চেহারাটা খুঁজতে চাইছিল। দীপুর ডাকে তার চমক ভাঙল। দীপুর হাতে এক গোছা জ্বলন্ত ধূপকাটি। মুঠো ভর্তি ধূপের গোছাগুলো শূন্যে নাড়তে নাড়তে বলল, 'গন্ধটা কেমন মেজদা? অর্ডারী জিনিস, বলে রেখেছি মাল খারাপ হলে পয়সা দেব না।'

দীপু নিজেই তারিফ করার ভঙ্গিতে সবার দিকে তাকাল রথীনের উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে ধূপের গোছা গুজে দিতে লাগল ধূপদানীতে। ফুলের গন্ধ আর ধূপের ধোঁয়ায় মিলে মিশে ঘরটা অন্য রকম হয়ে গেল। দীপু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রমার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'এবার নেকসট আইটেম কি ছোড়দি?'

সীতা যেহেতু এবাড়ির বড়দি, তাই মাসতুতো দিদি রমাকে সবাই

তাকে ছোড়দি বসে। রমা দীপুর দিকে তাকিয়ে ছিল, এবার গোটা ঘরের মধ্যে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এবার একটা গান-টান হোক, প্রেতিবার তো তাই হয়। সেজো তুই একটা গান কর।'

খাটের কোনায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল জয়ন্তী। ছোড়দির গায়ে মৃদু ধাক্কা দিয়ে বলে উঠল, 'আমি আবার কি গাইব। অনেকদিন ওসব পাট চুকিয়ে দিয়েছি।

রমাও নাছোড়বান্দার ভঙ্গিতে বলল, 'ওকথা বললে চলবে কেন। তুই ছাড়া এবাড়িতে গানটা জানে কে? রবিঠাকুরের একখানা গান গেয়ে হাঙ্গামা চুকিওে দাও।'

জয়ন্তীর খুব একটা ইচ্ছে ছিলনা। তবুও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। বড়দা এসে পড়লে তাকে গাইতেই হবে। জয়ন্তী ভেবে পায়না, কবে, কোন অতীতে এবাড়ির একমাত্র মেয়ে অকালে মারা গেছে, তাকে নিয়ে দুঃখ থাকতে পারে, কিন্তু তাকে নিয়ে এমন করে জন্মদিন করার কি মানে! যেন ভুলে যাওয়া অতীতের পৃষ্ঠা খুলে পুরনো শোক আর দুঃখটাকে নতুন করে ফিরিয়ে আনা। জয়ন্তী কোনদিন তাকে চোখেও দেখেনি। অতএব, বড়দিকে নিয়ে তার মধ্যে কোন আবেগ নেই। আজই দুপুরে খেতে বসে উমাকে বলেছিল জয়ন্তী, 'মা-বাবার জন্মদিন হয় সেটা না হয় বুঝি, কিন্তু বোনের জন্মদিন এজিনিস বাপু কোথাও দেখিনি।'

উমা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'আমায় বলছ বল, তাই বলে যেন বড়দা আর তার ভায়েদের সামনে বলো না, তাহলেই কুরুক্ষেত্র বাঁধবে।'

জয়ন্তী ঠোঁট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে জবাব দিয়েছিল, 'আমার বয়ে গেছে বলতে। তোমার দেওর তো বড়দা ছাড়া আর কারো কথা কানেই তোলে না। ভাগ্যস এটা কলিযুগ। তা নাহলে তোমার আমার অবস্থাও দৌপদীর মতো হতো। সকাই যে রকম জ্যেষ্ঠ অনুগামী, কবে যে···

কথাটা শেষ করতে পারেনি জয়ন্তী। ঘরে টেলিফোন বাজছিল বলে ওকে উঠে যেতে হয়েছিল।

দীপু এগিয়ে এসে হারমোনিয়ম নামিয়ে দিল। অগত্যা জয়ন্তীকে বসিতে হল গাইবার জন্য। হারমোনিয়মের রিড টিপে টিপে প্রথমে স্বর তুলল তারপর আস্তে আস্তে গাইতে আরম্ভ করল।

সদর দরজায় পা দিয়েই যতীন শুনতে পেল ওপরে গান হচ্ছে। নির্ঘাৎ সেজবৌয়ের গলা। ও ছাড়া এবাড়িতে কেউ হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গাইতে পারেনা। একজন পারত, তার জন্যে ডবল রীডের একটা হারমোনিয়ম কেনাও হয়েছিল। যতীন আস্তে আস্তে ভেতরের উঠোনে এসে দাঁড়াল। ওপরের বড় ঘরে জয়ন্তী গাইছে। ওর গলার স্বর ধীরে ধীরে অন্য রকম হয়ে এল যতীনের কানে। তার চোখ জুড়ে নেমে এল এক বিষন্ন গোধুলীর ফিকে অন্ধকার। অন্ধকারে জোনাকির মতো ফুটে উঠতে লাগল এক-একটা মুহূর্ত। কোনটা ছবির মতো ভেসে উঠে দু' দণ্ড দাঁড়ায়, কোনটা আবার দেখা দিয়েই অন্ধকারে হারিয়ে যায়। পড়ন্ত বিকেলের আসন্ন রোদ তখনও পাকা কামরাঙার মতো আলো ছড়িয়ে রেখেছে। দূর দিগন্তের কোল ঘেঁষে ধূসর পাহাড়, কোয়ার্টার্সের আঙ্গিনায় পেয়ারা আর বাতাবী লেবুর গাছ। সামনেব মাঠে মাঝ চৈত্রের আধ মাতাল চৈতী হাওয়া। একটা সুটকেশ হাতে বাবা এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। যতীন পেয়ারা তালায় দাঁড়িয়ে। রিকশা এসে গেছে। বাবা রিকশায় গিযে উঠলেন। রিকশায় বসে বিরক্ত মুখে দরজার দিকে তাকালেন, বাবার বোধহয় ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছিল। দরজার পর্দা সরিয়ে সীতা এল, পেছনে মা। বাবার সঙ্গে সীতাও যাবে। যতীনের বুকে অভিমান থমথম করছিল। বাবা যাবেন অফিসের কাজে, সীতাকে কেন সঙ্গে নিয়ে যাবেন? সীতারই বুঝি বেনারস দেখার শখ, যতীন ছেলে বলে তার বুঝি কোন শখ থাকতে নেই। একমাত্র মেয়ে বলে ওর আবদারটাই রাখতে হবে এটা কেমন কথা।

রিকশায় উঠতে গিয়ে সীতা তাকল যতীনের দিকে। যতীন মুখ ফেরাল। রিকশার উঠে বসতেই বাবা বললেন, 'স্টেশন চল।'

যতীন মুখ ফিরিয়ে দেখল রিকশাটা চলতে শুরু করেছে। রিকশার মাথার ওপরের ঢাকমি তোলা। পেছনের পর্দা তুলে সীতা

পেছনে তাকিয়ে। নিজের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে রেখেছে। বেড়াতে যাবার আগে সীতা কাঁদছে কেন? দাদাকে ছেড়ে যাচ্ছে বলে? যতীন নিজের অভিমান ভুলে গিয়ে রিকশার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল। সীতা হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু যতীন ধরতে পারল না। রিকশাটা বড় সরকে পড়ে ততক্ষণে জোরে ছুটতে আরম্ভ করেছে। সীতার জলে ভেজা চোখ যতীনকে নিজের অভিমান ভুলিয়ে দিল। প্রায় একুশ দিন পরে বাবা ফিরে এলেন একা। সীতা আসে নি। ওখানে গিয়ে হঠাৎ অসুখে পড়ে। চারদিনের অসুখেই সীতা মারা গেল। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে মা সারারাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল। নিজের ঘরে বালিশে মুখ ঢেকে কান্না থামাবার অবিরাম চেষ্টা করে চলল যতীন। সেদিন তার চোখে সীতার যাবার দিনের ছবিটাই বার বার ভেসে উঠছিল। তখনও কেউ জানত না, এটাই ওর শেষযাত্রা।

সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে যতীন থেমে গেল। জয়ন্তীর গানটা তখনও চলছিল। জয়ন্তী কি নিজের ইচ্ছায় এই গানটা গাইছে না কি ওকে কেউ বলে দিয়েছে। কে বলে দিতে পারে? যতীন ছাড়া এবাড়িতে আর কারো জানবার কথা নয় কোন গানটা গেয়ে সীতা স্কুলে প্রাইজ পেয়েছিল। যতীন আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল ওপরে। গানটা থেমে যেতেই যতীন দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। রথীনই প্রথম দেখতে পেল বড়দাকে, কিন্তু ডাকবার সাহস হল না। তার মনে হল এই মুহূর্তে দরজায় এসে দাঁড়ানো শান্ত, সমাহিত মানুষটা তাদের বড়দা হলেও সে এখন অনেক দূরের মানুষ। কিন্তু ঘরের সবাই রথীন নয়, অতএব গান থেমে যেতেই সবাই বড়দাকে দেখে কলরব করে উঠল। হারমোনিয়মের কাছ থেকে সন্টু ছুটে এসে জেঠুর গলা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু সবার গলা ছাপিয়ে উঠল রমার কণ্ঠ, 'লোক বটে তুই একটা। তোর জন্যে বসে বসে শেষে আমরাই আরম্ভ করে দিলাম। একটা দিনও কি তোর একটু আগে আসতে নেই বড়দা!'

ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে যতীন বলল, 'আমি তো

ঠিক সময়েই এসেছি। উঠোনে পা দিয়েই তো শুনলাম জয়ন্তী গান গাইছে। গোটা গানটা শুনে তারপর ওপরে এলাম।'

জয়ন্তী হারমোনিয়মটা ঠেলে দিতে দিতে বলল, 'আপনি শুনেছেন গান?'

যতীন সন্টুকে কোলে তুলে নিতে নিতে বলল, 'পুরোটাই শুনেছি। চমৎকার গেয়েছো। কিন্তু এ গানটা কে বাছল, তুমি?'

জয়ন্তী বড়দার প্রশ্নটার জন্যে তৈরি ছিল না। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ গানটা ভাল নয়?'

যতীন নরম গলায় বলল, 'খুব ভাল, কিন্তু আমার কাছে, অন্তত আজকের দিনটায় এই গানটা যতটা ভালো, ততটাই যে দুঃখের।'

জয়ন্তী অবাক চোখে ভাসুরের দিকে তাকাল। বলল, 'দুঃখের!'

সন্টুকে কোলে তুলে নিয়েছিল যতীন। এবার ওকে নামিয়ে দিয়ে নিজে বসল। বলল, 'তুমি ঠিক বুঝতে পারবে না। হয়তো রথীনের কিছুটা মনে থাকলেও থাকতে পারে। সীতা এই গানটা খুব ভাল গাইতো। এই গানের জন্যেই ওকে স্কুল থেকে প্রাইজ দিয়েছিল। ওর গলায় আমি বোধহয় পাঁচ-ছ'বার এই গান শুনেছি।'

কথা বলতে বলতে যতীন টেবিলের ওপর রাখা সীতার ফটোটার দিকে তাকাল। দৃষ্টি সরাল না। ফটোটার দিকে চোখ রেখেই বলল, বীথিন ফেরেনি?'

উমা উত্তর দিল, 'ঠাকুরপোর তো আজ নার্সিং হোম আছে।'

কথাটা যেন ভুলে গিয়েছিল, উমা বলে দেওয়ায় হঠাৎ মনে পড়ল যতীনের। সে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'তাইতো, বুধবার তো ওর নার্সিং হোম থাকে।'

কথা শেষ করেই যতীন আবার নিজের মধ্যে ডুবে গেল। ফটোটার দিকে চোখ রেখে উদাস সুরে যতীন বলল, 'রথী তখন খুব ছোট, ওর মনে থাকবার কথা নয়। একবার দোলের দিনে পিসে-মশাই আমার আর সীতার একসঙ্গে একটা ফটো তুলে দিয়েছিল। তিনসুকিয়ার কোয়াটার্সে বারান্দায় তোলা জীবনের প্রথম ফটো।

আর ওই ফটোটা কার কাছে থাকবে সেই নিয়েই ছিল আমাদের রোজকার ঝগড়া। শেষে ঠিক হয়েছিল সাতদিন ওর কাছে আর সাত-দিন আমার কাছে। যেহেতু সীতা ছোট তাই প্রথম সাতদিন ওর কাছেই থাকবে ফটোটা। পিসেমশাইয়ের এই বিচারে আমি অবশ্য খুশি হইনি, কিন্তু মেনে নিয়েছিলাম। আমার অখুশিটা সীতা ধরতে পেরেছিল। রাত্রে পড়ার টেবিলে ছবিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, না দাদা, এটা তোর কাছেই থাক। তোর কাছে থাকা মানে তো আমার কাছেই থাকা—তুই রাখ। এই ছিল সীতা! কোন কিছুতে জেতাতেই ওর আনন্দ, কিন্তু আবার আনন্দের মধ্যে পরাজয়ও ওর কাছে কখনও কখনও জয়ের অধিক মূল্যবান ছিল। সেই ছবিটা এখন আমার বাক্সে রয়ে গেছে, আজ আর ওর কোন দাবীদার নেই। দিনগুলো কত তাড়াতাড়ি চলে যায় তাই ভাবি।'

ঘরের বাতাসটা ভারী হয়ে উঠছিল। যতীনের গলার স্বরে এমন একটা উদাস বিষন্নতা ছিল যা এই ঘরের প্রত্যেককে ছুঁয়ে গেল। রমা নিঃশব্দে পান সেজে যাচ্ছিল। উমার চোখ নিচের দিকে নামনো। রথীন চুপচাপ বসে। এই গুমোট ভাবটা দীপুর অসহ্য। আবহাওয়া বদলবার জন্য সে বলে উঠল, 'ধূপের গন্ধটা কেমন বড়দা?'

যতীন মুখ ফেরাল। বলল, 'নিশ্চয়ই তুই এনেছিস?'

দীপু বলল, 'আমাদের ব্যাঙ্কের দরোয়ান বিক্রি করে। দারুণ জিনিস! তুমি একবার নিজে মুখে সার্টিফিকেট দাও।'

যতীন হেসে ফেলে বলল, 'মুখে দিয়ে কী হবে, আমি বরং আমার প্রেস থেকে ছাপিয়ে এনে দেবে।'

কথাটা শেষ করেই যতীন উমাকে বলল, 'আমাদের জন্য একটু চা-টা করো। অজিত তো অফিস থেকে আসছে। ওদের জন্য খাবার-দাবার···

উমা কিছু বলবার আগেই রমা বলে উঠল, 'সে তোকে কিছু বলতে হবেনা। আমাদের মেজো সেদিকে খুব খেয়ালী। তোর বলার আগেই সব তৈরি করে রেখেছে।'

যতীন আস্তে আস্তে তার স্বভাবে ফিরে আসছিল। রমার কথা শুনে নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'সেটাও কিন্তু আমারই জন্যে। তোদের মেজো তো আমারই পছন্দ করে আনা।'

যতীনের কথায় ঘরের সবাই শব্দ করে হেসে উঠল। খানিক আগের গুমোট ভাবটা কেটে গেছে। টুকরো-টুকরো হাসি-তামাশার মধ্যে দিয়ে সময়টা এগিয়ে চলল।

রাতের খাওয়ার পাট চুকে যাবার পর যতীন নিজের ঘরে এল। মশারীর মধ্যে সন্টু ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেছে। যতীন দরজা বন্ধ করে দিয়ে আলমারীটা খুলল। আলমারীর নিচে সেই বাক্সটা আছে যার মধ্যে সেই ছবিটা এখনও রাখা। যতীন ছবিটা বার করে এনে টেবিলে বসল। টেবিলের আলোটা জ্বেলে দিয়ে ছবিটা দেখতে লাগল। অনেক কিছুই ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু ছবিটার দিকে চোখ রাখলে যতীন যেন তিনসুকিয়ার দিনগুলোকে বড় বেশি স্পষ্ট দেখতে পায়। সেই সব দিনগুলো কবে কেমন করে হারিয়ে গেল সেকথা জানা যায় না। শুধু একটা মাত্র কাঁটা বিঁধে আছে বুকের মধ্যে। যতীন জানে সেই কাঁটাটার নাম সীতা। মাঝে-মাঝে সেই কাঁটাটাই যতীনকে রক্তাক্ত করে। একটা বিমূঢ় ভাবানায় আচ্ছন্ন করে রাখে। যতীন ছাড়া আর কেউ জানে না, হয়তো ভাবেও নি কোনদিন সীতার অকাল মৃত্যুর মধ্যে কোন রহস্য থেকে গেছে কিনা। যতীনের আসল যন্ত্রণাটা সেখানেই। যতীন যদি ওই বয়েস সব জানতো, আজকের ছেলেদের মতো সব বুঝতো তাহলে হয়তো তার মধ্যে কোন যন্ত্রণা থাকতো না। কিন্তু কিছুটা জানা আর বাকীটা অনুমান দিয়ে যা বোঝা যায় সেটা কতখানি সত্যি সেটা জানা যায় নি। সীতা হয়তো অকালেই মরেছে, নিশ্চয়ই মরেছে। মৃত্যুকে নিয়ে কোন রহস্য নেই। রহস্যটা রেখে গেছে মা। বাবা মারা যাবার পরও কয়েক বছর মা বেঁচে ছিলেন। কলকাতার ছিদামমুদী লেনের এই বাড়িটায় তখন ভয়ঙ্কর দিন যাপনের পালা। একমাত্র সাবালক যতীন। কলেজ বি. এ. পড়তে পড়তে পড়া ছেড়ে দিয়ে

বড়বাজারের খাতা লেখার কাজ নিতে হল। যতীনের রোজগারে তখন গোটা সংসার, সংসারের পাঁচটা প্রাণী, সঙ্গে মাসতুতো বোন রমা। মেসোমশাই থাকেন পাটনায়। রমা থাকে বলে মাসে মাসে একশ করে টাক পাঠান। বাকীটা জোগাড় করতে হয় যতীনকে। সেই সময়, সেইসব দিনের কোন একটি রাতে সীতারএই ছবিটা বাক্স ঘাঁটতে ঘাঁটতে বেরিয়ে পড়েছিল। আর সেইদিনই ঘটেছিল ঘটনাটা, একেবারে নাটকের মতো একটা ব্যাপার। যতীন ছবিটার দিকে তাকিয়ে সেইদিনের ঘটনাকে মনে কবতে লাগল।

যতীন টের পাচ্ছে তার চোখ জ্বালা করছে। মেঘলা আকাশের মতো বুকটা ভার মনে হচ্ছে। যতীন ছবিটাকে বাক্সে রেখে জানালার সামনে এল। বাইরে ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। অন্ধকার গলির মধ্যে চলমান রিকশার আওয়াজ। কিছুতেই মন বসছিল না যতীনের। একটা চাপা অস্থিরতা তাকে ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত করছে। যতীন টেবিলের কাছে ফিরে এসে জল খেল। চেয়ারে বসে থাকল খানিকক্ষণ। বাইরে রাত বেড়ে চলেছে। কোন গাড়ির আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছেনা। ছিদামমুদী লেনে ঘুমের রাজত্ব নেমে এসেছে তবু যতীন ঘুমোতে পারছে না। তার ভেতরটা উত্তেজনায় কাঁপছে। এই কম্পনের সঠিক অর্থ যতীন জানেনা। এটা আক্রোশ না ভয়, আতঙ্ক না আক্ষেপ যতীন জানেনা। তার শুধু ঘুরে ফিরে তিন-সুকিয়ার বাড়িটা মনে পড়ছে। সীতার বেনারস বেড়াতে যাবার দিনটা। বাবার গম্ভীর এবং বিরক্ত মুখ। মা'র উদাস দৃষ্টি। বাবার একার ফিরে আসার মুহূর্তটা। ঝড়ে ভেঙে পড়া গাছের মতো বিপন্ন আর বিপর্যস্ত বাবাকে। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে সারারাত মা'য়ের বুক নিঙড়ে উঠে আসা কান্নার শব্দ। তারই মধ্যে, শুধু একবার মাত্র একবারই চাপা ঘড়ঘড়ে গলায় বাবার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'কেঁদে আর কি করবি! যত তাড়াতাড়ি হোক আমাদের তিন-সুকিয়া ছাড়তে হবে।'

কোন মন্ত্রবলে কে জানে কিংবা হয়তো কোন দৈব অনুগ্রহেই বাবা দু'মাসের মধ্যে বদলী হয়ে এলেন মোগলসরাই। বছর দুই

যেতে না যেতেই চলে এলেন হাওড়া। তিনসুকিয়ার কোন লোককে যদি বাবা কিংবা মা কখনও মোগলসারাইতে দেখতেন তাহলেই চমকে উঠে এগিয়ে যেতেন। অথচ যতীন জানে না কেন এমন করতেন ওঁরা। তিনসুকিয়ার লোককে দেখলে যতীনের ভালো লাগত। ইচ্ছে করতো গিয়ে গল্প করি, বন্ধুদের কথা জিজ্ঞেস করি, কিন্তু মা পছন্দ করতেন না। সীতার মৃত্যুর পর বাবা আর মা যেন অনেকখানি বদলে গিয়েছিল। ছেলেদের সঙ্গে বাবার দূরত্বটা ক্রমশ বাড়ছিল।

কিন্তু ছিদামমুদী লেনের বাড়িতে আসার পর মা অনেকটা আগের মতো হতে পেরেছিল কিন্তু বাবা আর পারেন নি। বাবা মারা যাওয়ার পর সংসারের দায়টা সামলাতে হল যতীনকে। ভায়েরা তখন স্কুলে-কলেজে পড়ে। ওরা খেয়ে দেয়ে দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ত। ভাত নিয়ে বসে থাকতো মা। সংসারের নানা কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে যতীন তখন মাকে খুব কাছে পেত। অনেক রাত পর্যন্ত একজন দুঃখী মা আর তার ছেলে মুখোমুখি বসে ভাবত কাল কেমন করে কাটবে? রথীনের কলেজের মাইনে, বীথিনের পরীক্ষার টাকা, রেশন, এত টাকার দায় কেমন করে সামলে উঠবে।

এই রকমই একটা ভাবনার দিন ছিল সেটা। রথীনের পরীক্ষার টাকা জমা দিতে হবে, বীথিনের কলেজের ভর্তির জন্য টাকা চাই। প্রয়োজনের অনেকগুলো মুখ হাঁ করে আছে অথচ প্রতিকার নেই। নিজের বাক্সে মাঝে-মধ্যে সিকি-আধুলি কিংবা টাকার নোট রেখে দিত যতীন। খুব আটকে গেলে বাক্স হাতড়ে বার করতো সেই সঞ্চয়। সেদিন বাক্স হাতড়াতে গিয়ে বেরিয়ে এল ওদের ছবিটা। ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল কেউ ঘরে এসেছে। পেছন ফিরে যতীন দেখল মা। ছবিটা উল্টো করে রেখে যতীন উঠে দাঁড়াল। মা বললেন, 'আমি জানি টাকার চিন্তায় তুই রাতে ঘুমোতে পারছিল না। অনেক ভেবে কোন উপায় না দেখে শেষে এইটা নিয়ে এলাম। এইটা বেচে সমস্যাটা মিটিয়ে ফেল।

কথাটা বলেই মা লাল কাপড়ের টুকরোয় জড়ানো একটা জিনিস

তোবলে রাখলেন জড়ানো কাপড়টা খুলে ফেলেই যতীন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। বলল, 'একি? এ জিনিস তুমি কোথায় পেলে?'

মা'র চোখের কোলে জল চিকচিক করে উঠল। ঠোঁট টিপে কান্না সামলাতে সামলাতে বললেন, 'যার জিনিস সেই তো চলে গেল। এটা গড়িয়ে ছিলাম ওর বিয়েতে দেব বলে। এতদিন বুকে করে রেখেছি, ভেবেছি তোর বৌকে দিয়ে যাব, সেও তো মেয়ের মতো। এখন ভাবছি, না, দরকার নেই। জিনিসটা বোধ হয় অভিশপ্ত, এই বালা কাউকে দেবার নয়।'

যতীন রাজি হচ্ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী হতে হল। বিক্রি অথবা বন্ধক যাই করে হোক টাকা আনতে হবে। কিন্তু বিক্রি করতে মন চায়নি যতীনের। বন্ধক দিয়ে টাকা নিয়ে এসেছিল। সেদিন রাতেই খেতে বসে সীতার বিয়ের জন্য তৈরি বালা, তিন—সুকিয়ার দিন গুলো আর সীতার মৃত্যু এসব নিয়ে আলোচনা করতে করতে হঠাৎ মা বলে ফেলেছিল, 'খোকা, এবার তোর মেসোমশাই এলে রমাকে নিয়ে যেতে বলিস। আমি চোখ বুঁজলে তোরা সব সামলাতে পারবি না। সীতাকে তো আমি সামলাতে পারিনি, তাই চিরকাল তোর বাবা আমাকে দুষেছে।'

যতীন খেতে খেতে মুখ তুলে বলল, 'তার মানে?'

কিন্তু উত্তর দেবার আগেই যতীন দেখল মা কথা বলতে পারছে না। দুর্বোধ্য যন্ত্রণায় তার ঠোঁট কাঁপছে।

॥ ২ ॥

সেই বালা জোড়া এখনও যতীনের বাক্সে লাল ন্যাকড়ায় জড়ানো আছে। সুদে আসলে মিলিয়ে অনেকগুলো টাকা গুণে দিতে হয়েছে অভয় দাশকে, তবুও জিনিসটা হাত ছাড়া করতে চাইনি। সীতার নাম করেই তো জিনিসটা মা বানিয়েছিল, তিনসুকিয়ার বাড়িতে অনেকবার ওকে পরতেও দেখেছে যতীন। বেনারস বাবার

সময় রিকশা থেকে সীতা যখন হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল তখনও তার হাতে এই বালা ছিল। মেয়েটাকে বাবা বেনারসের ঘাটে পুড়িয়ে এসেছিলেন হয়তো, কিন্তু মরা মেয়ের সোনার বালাটা মনে করে আনতে ভোলেন নি। সোনা যে মানুষের চাইতে দামি সে তো কখনও কখনও টের পাওয়া যায়। মাস খানেক অসুখে ভুগে বাবা যখন হঠাৎ একদিন মারা গেলেন, যতীন তখন কলেজে। কে যেন কলেজে খবর দিতে গিয়েছিল, বাড়ি ঢুকেই যতীন বুঝল সর্বনাশ হয়ে গেছে। বাবার পায়ের কাছে মাথা গুঁজে মা গুমরে গুমরে কেঁদে যাচ্ছে। রথীন আর বীথিন দেওয়ালে মুখ রেখে কোঁপাচ্ছে। দীপু এত ছোট যে, সর্বনাশটা বুঝে উঠতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল চোখে সবাইকে দেখছে। শুধু এক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হয়েছিল ছিদামমুদী লেনের এই বাড়িটা যেন ভূমিকম্পের মতো কেঁপে উঠল।

ঠিক মনে নেই, বোধ হয় পাশের বাড়ির কাকিমা তার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল। ঘরে খাটের ওপর বাবা শুয়ে। বোধহয় কেউ তাঁর চোখের ওপর দুটো তুলসীপাতা রেখে দিয়েছে। যতীনের বুকের ভেতরটা শূন্য হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সেই অবস্থাটা অনুভব করবার মতো সময় ছিল না। কাঁদবার মতো সুযোগও সেদিন যতীন পায়নি। মা কে কোন রকম বিরক্ত না করে আলমারী থেকে টাকা নিয়ে উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে জানে অনেক বড় কাজ এখনও বাকি, সেটা তাকেই করতে হবে। বাবার দেহটা যখন খাটের ওপর থেকে তুলে এনে বারান্দার খাটিয়ায় শুইয়ে দেওয়া হল তখন দীপু ছুটে এসে যতীনকে জড়িয়ে ধরে জানতে চেয়েছিল, 'বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বড়দা?'

যতীন উত্তর দিতে পারে নি। তার বুকের মধ্যে একটা দামাল বাতাসের ছোটাছুটি চলছিল। দীপুর প্রশ্নে এই প্রথম তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। হাত তুলে জামার হাতায় চোখের জল মুছে নিতে গিয়ে শুনল, রমা তার কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলছে 'বড়দা বড়মেসোর হাতের আংটিটা সোনার। ওটা খুলে রাখ।

যতীন পারেনি। রমা খুলতে গিয়ে বুঝেছিল ব্যাপারটা সোজা

সোজা নয়। মানুষ মরে গেলে শরীর আস্তে আস্তে শক্ত হয়ে যায়। বড় মেসোর শরীর বোধ হয় শুধু শক্ত নয়, একটু ফুলেও গিয়েছিল। আংটি খোলা খুব সহজ নয়। মৃত মানুষের চাইতে সোনা অনেক দামী। অতএব, ব্যবস্থা হতে দেরী হল না। যতীন দেখল রমা আংটিটা নিয়ে মাকে দিল, মা আপত্তি করেন নি। রমাকে কি একটা যেন বলেছিল। রমা আলমারীর কৌটোতে আংটিটা তুলে রেখেছিল। প্রবল শোকের মধ্যেও মানুষ এইসব হিসেবে কখনও ভুল করে না। চোখের জল মুছতে মুছতেও রথীন ডোমেদের কাঠের হিসেবে কারচুপি ধরে ফেলেছিল। অতএব, মেয়ে মরে গেছে বলে তার বালা জোড়া যে বাবা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আসেন নি সেটাই তো স্বাভাবিক। বিপদের দিনে এই বালা জোড়াই রক্ষকের ভূমিকা পালন করেছে।

কিন্তু যতীনের মনের মধ্যে কোথাও যেন একটা কাঁটা খচখচ করে। মানুষ মরে গেলেই সে একেবারে হারিয়ে যায় না। সতী যেন যতীনের মনের মধ্যে থেকে গেছে। তার বার বার মনে হয়েছে, মৃত সীতার হাত থেকে কষ্ট করে বাবা ওই বালা জোড়া খুলে নিয়েছেন। সেই বালা কাউকে দেবার নয়। মা চেয়েছিলেন, যতীনের বৌ পরবে। কিন্তু যতীনের মনে হয়েছে, এই বালা আর কারো হাতেই মানাবে না। অনেক দিন লাল ন্যাকড়ায় জড়ানো জিনিসটা যতীন দেখেনি। দেখতে ভালো লাগে না। দেখলেই ওর কেবল সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে, তিনসুকিয়ার কেয়ার্টার্স থেকে রিকশাটা চলে যাচ্ছে। পেছনের পর্দা তুলে হাত বাড়িয়েছে সীতা। রাস্তার বাঁক ঘুরে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই হাত।

জীবনের ফেলে আসা দিনগুলো এই সব মুহূর্তে আস্তে আস্তে যতীনের কাছে ছবির মতো উঠে আসে। বাবার মৃত্যু দিয়ে যে সর্বনাশের রচনা, সেই সর্বনাশের গহ্বরে সংসারকে তলিয়ে যেতে দেয়নি যতীন। বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। বড়বাজারে খাতা লেখার কাজ দিয়ে নতুন জীবন শুরু হয়েছিল। তারপর কলেজ স্ট্রীটের পাবলিশার্স পাড়ায় প্রুফ দেখার কাজ। ওখান থেকে বৌ-বাজার প্রেসের ম্যানেজার। ভাগ্যের চাকাটা অনড় থেকেছিল

বহুদিন। অনেক বিনিদ্র রাত, চোখের জল আর ঘর্মাক্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যতীন আস্তে আস্তে টের পেয়ে গিয়েছিল জীবন কী রকম, আর বেঁচে থাকাটা কত কষ্টের। তবুও কিছুই থেমে থাকেনি, থেমে থাকতে দেয়নি যতীন। নানা জোড়াতালির মধ্য দিয়ে ভাইদের পড়াশোনা, সংসারে এতগুলো প্রাণীর খাওয়া-পরা সব মিটিয়ে এসেছে। ভালো মানুষ বলে একটা সুনাম ছিল যতীনের, সেই সুনামটাই তাকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। বইপাড়ার লোকদের কাছে যতীন যেন রূপকথার মানুষ। রথীনের চাকরী হবার পর বীথিন যেবার ডাক্তারী পাশ করল, সেবারই ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে প্রেসটা কিনে ফেলেছিল যতীন। নড়বড়ে প্রেসটাকে দাঁড় করাতে ছ'মাসেরও বেশি সময় লাগেনি তার। বইপাড়ার দেদার কাজ তো ছিলই, সেই সঙ্গে জুটিয়ে নিয়েছিল দু'খানা ব্যাঙ্কের কাজও। যেদিন যতীনের প্রথম মনে হল, অনেকটা পথ এক নাগাড়ে দৌড়ে এসে এবার বোধ হয় বিশ্রাম নেওয়া যায়, নিজের জন্য একটু স্বপ্ন বোধ হয় এখন সে দেখতে পারে, সেদিনই দাড়ি কামাতে বসে যতীন লক্ষ্য করল সময় তাকে রেহাই দেয়নি, তার সারা শরীরে সেই ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মাথার চুল কমে গেছে, রগের দু'পাশে দাউ দাউ করে জ্বলছে সাদা চুলের সারি। গালের দাড়িতেও সাদার অংশ এখন সমান-সমান। বেশ ভারিক্কি চেহারা, এই চেহারায় ছাঁদনাতলায় তাকে মানাবে না। আয়নার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল যতীন। মনে মনে ভেবেছিল, যৌবন হয়তো এসেছিল কিন্তু সেটা বুঝতে পারলাম যৌবন চলে যাবার পর। নিজের হাসিটাকে নিজের চোখেই সেদিন করুণ মনে হয়েছিল। এখন আর সেসব নিয়ে ভাবে না যতীন বরং মনে মনে ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ হয়, ভগবান যেন পাওনার থেকেও বেশি দিয়েছেন তাঁকে। রথীন এখন অফিসার, বীথিন রীতিমতো ব্যস্ত ডাক্তার, নিজে গাড়ি চালিয়ে চেম্বারে যাওয়া-আসা করে। আর দীপুও চাকরী পেয়ে গেছে ব্যাঙ্কে। বাবা যখন চোখ বুজেছিলেন তখন সংসারে শুধু অনিশ্চয়তা ছাড়া আর কিছু তিনি দেখে যেতে পারেন নি। মা তার চাইতে ভাল অবস্থা দেখে গেছেন। রথীন তখন চাকরী পেয়েছে।

বীথিন ডাক্তারী পরীক্ষা দেবে। দীপু তখনও পড়ছে। শুধু একজন, এই পরিবারের শুধুমাত্র একজন কোন কিছুই দেখে যেতে পারেনি। তার চলে যাওয়াটাই ছিল অবিশ্বাস্য। এত হঠাৎ করে কেউ যে চলে যেতে পারে সেটা যতীনের বিশ্বাস করতে সময় লেগেছিল।

রাতের ভাবনাগুলো প্রেসে এলে আর যতীনের মাথায় থাকে না। সকাল থেকে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা ফেলে ফেলে যতীন এগিয়ে চলে। বাড়িতে দীপু বলে, 'দাদা ঘড়ি দেখে চলে না, ঘড়িই দাদাকে দেখে চলে।' প্রেসের কাজকর্ম ছাড়াও সংসারের কয়েকটা কাজ যতীনের জন্য বরাদ্দ করা। এই দায়িত্ব যতীন ছাড়া আর কারো নেবার প্রশ্ন ওঠে না। সকালে বাজার করা, সন্টুকে স্কুলে দিয়ে আসা এবং বারান্দার টেবিল ঘড়িটাতে দম দেওয়া যতীনেব নিত্যকর্ম পদ্ধতি। এসব করেও ঠিক দশটার মধ্যে সে প্রেসে এসে যায়।

আজ প্রেসে এসে নিজের ঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখল একজন লোক তার টেবিলের সামনে বসে। লোকটাকে সে কখনও দেখেছে বলে মনে করতে পারল না। নিজের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'আপনি কাকে চাইছেন?'

প্রশ্নটা করতে গিয়েই যতীন লোকটাকে লক্ষ্য করল। প্রায় ষাটের কাছাকাছি বয়স। বয়সের তুলনায় শরীরটা বেশ মজবুত। যতীনের প্রশ্ন শুনে লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। বলল, 'আমার নাম জয়দেব মাইতি। আমার ছেলে গোবিন্দ আপনার এখানে কাজ করে। আমি ওর বিষয়ে আপনার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলতে এসেছি!'

যতীন চশমাটা খুলে টেবিলে রাখল। টেবিলে জলের গ্লাস রাখা আছে। তারপর এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে বলল, 'গোবিন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

জয়দেব মাইতি হাত তুলে নিষেধের ভঙ্গিতে বলল, 'ছেলের সঙ্গে দেখা করতে আমি আসিনি। আমার দরকার আপনার সঙ্গে।'

যতীন মনে মনে অবাক হল। মুখে বলল, 'বলুন কী দরকার।'

জয়দেব মাইতি কথাটা বলবার জন্যে মিনিট খানেক চুপ করে

থেকে ভাবল।

যতীন লক্ষ্য করল জয়দেব মাইতি মাথা নিচু করে কিছু ভাবছে। যতীন চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগল। প্রায় মিনিট খানেক পরে জয়দেব মাইতি মুখ তুলল, চাপা অভিযোগের সুরে বলল, 'গোবিন্দ আমার একমাত্র ছেলে। বড় সাধ করে ছেলেটার বিয়ে দিয়েছিলাম। একটি মেয়েও আছে। অথচ আজ ছ'মাস হল ছেলেটা ছুটি-ছাটায় বাড়ি যায় না, টাকাও পাঠায় না, এমনকি নিজের স্ত্রী চিঠি দিলে তার জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন মনে করে না। কলকাতায় কী করে, কাদের সঙ্গে মেশে, কিছুই জানি না। কানাঘুষোয় শুনি, গোবিন্দ নাকি গোল্লায় গেছে, খারাপ সঙ্গে মিশে আজেবাজে জায়গায় যাতায়াতের অভ্যাস করেছে।'

যতীনের কপালে ভাঁজ পড়ল। তীক্ষ্ণ চোখে জয়দেব মাইতির দিকে তাকিয়ে থাকল যতীন। জয়দেব মাইতি আগের মতোই বলে চলল, 'আপনি তো প্রায় ওর পিতৃতুল্য, আপনি যদি ওকে একটু সুপথে আনতে পারেন সেই আর্জি জানাতেই আমার ছুটে আসা।'

যতীন চশমাটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে চোখে পরল। জয়দেব মাইতির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি সরাতে গিয়ে তার মনে হল, লোকটা যথেষ্ট বিপন্ন, নাহলে এভাবে ছুটে আসতো না। একজন বিপন্ন বাপের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে গোবিন্দর বৌ আর মেয়ের কথাটা ভাবল। হয়তো চার-পাঁচ বছরের একটি মেয়ে। গোবিন্দ তার বাপ, অথচ মেয়েটা সম্পূর্ণ বিনা কারণে বাপের উপেক্ষা সহ্য করছে। যতীনের ভেতরে ভেতরে রাগ হতে লাগল। প্রেসের সব কর্মচারীই তাঁর আত্মীয়ের মতো। তাদের মধ্যে এমন অমানুষও থাকতে পারে!

যতীন ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আপনি নিশ্চিন্তে ফিরে যান মাইতি মশাই। আপনার কথা ঠিক হলে আমি কথা দিচ্ছি, গোবিন্দকে আমি শায়েস্তা করব।'

জয়দেব মাইতি চমকে উঠে তাকাল। তার দু'চোখে আতঙ্কের ছায়া কাঁপছে। গলার স্বর নামিয়ে এনে বলল, 'দেখবেন যেন

চাকরী থেকে তাড়িয়ে দেবেন না। তাহলে আর ওর নাগালই পাব না। যদি বুঝিয়ে পারেন।...

জয়দেব মাইতির কথা শেষ হবার আগেই যতীন বলল, 'আপনি ঘাবড়াবেন না, আমি যা ব্যবস্থা কবব সেটা আপনাদেব মঙ্গলেব কথা ভেবেই।'

যতীনের মনে হল তাব কথায় লোকটা যেন ভরসার পেয়েছে। মুখের চেহারায় যে উদ্বেগ আর বিপন্নভাব ছবি ফুটে উঠেছিল খানিক আগে, এখন সেটা প্রায অদৃশ্য। জয়দেব মাইতি উঠে দাঁড়াল। হাত জোড় করে যতীনকে নমস্কার করে বেবিযে গেল।

যতীন খানিকক্ষণ দরজাব দিকে তাকিযে থাকল। তাব ভেতরের রাগটা দপদপ করছে। ব্যাপাবটা ভালো কবে না জানা পর্যন্ত তার স্বস্তি হচ্ছে না। যতীন নিজেব চেয়ার ছেড়ে প্রেসেব ভেতরে ঢুকল। কম্পোজেব ঘর ছাড়িয়ে মেশিন ঘবে এল। মেশিন ঘবে ঢুকতেই লতিফ এগিয়ে এল। যতীন বলল, 'তোমাব মেশিনে এখন কি চলছে লতিফ?'

লতিফ হাতের তামাব আংটিটা ঘোবাতে ঘোবাতে বলল, 'দত্ত বাবুদের কভারটা মেশিনে চাপানো আছে।'

যতীন মেশিনটার দিকে একবার তাকাল। তারপর বলল, 'হাতের কাজটা মিটে গেলে আমাব সঙ্গে একবাব দেখা কববে, জরুরী কথা আছে।'

বড়বাবু সাধারণত এভাবে কথা বলেন না, তাই লতিফ অবাক চোখে চাইল। বড়বাবু ফিরে যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'গোবিন্দকে দেখছি না তো. সে কোথায়?'

লতিফ মুখে বিরক্তি প্রকাশ করে বলল, 'আজও কামাই মেরেছে। আজ নিয়ে দু'দিন এ হপ্তায় ডুব দিল।'

যতীনের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। নিজের টেবিলে বসতে বসতে মনে হল জয়দেব মাইতির কথার মধ্যে হয়তো অনেকটাই সত্যি আছে। কিন্তু আজেবাজে জায়গায় যাতায়াত করে কথাটার মানে কি? গোবিন্দ কি রেস-টেস খেলে? কিংবা জুয়া-সাট্টা এইসব?

গোবিন্দকে নিয়ে ভাবতে ভাবতে যতীন তার নিজের কাজে ডুবে

গেল। কাজ করতে করতেই টের পেল তার ঘরে কেউ এসেছে। মুখ তুলে যতীন দেখল লতিফ তার সামনে দাঁড়িয়ে। লতিফকে দেখে গোবিন্দর কথাটা মনে পড়ে গেল যতীনের। যতীন বলল, 'বসো, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

লতিফ ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারছিল না। বড়বাবুর সামনে সে সাধারণত বসে না, অতএব দাঁড়িয়ে রইল। যতীন হাতের কাজ থামিয়ে রেখে বলল, 'গোবিন্দ কি মাঝে মাঝেই কামাই করে?'

লতিফ মাথা নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ, করে।'

যতীন চশমাটা খুলে নিয়ে চশমার ডাঁটটা থুতনীর কাছে ঘষতে ঘষতে বলল, 'একটু আগে গোবিন্দর বাবা এসেছিলেন। ও নাকি আজ ছ'মাস হল বাড়িতে যায়না, টাকাও পাঠায় না। অথচ বাড়িতে মা-বাবা, বৌ এমনকি একটা মেয়েও আছে। ওর ঘটনাটা কি বলতো?'

লতিফ একটু ইতস্ততঃ করে বলল, 'ওর কথা বড়বাবু আমায় বলবেন না। হরদম কামাই মারছে তাছাড়া ওর স্বভাবও বিগড়ে গেছে।'

যতীনের চোখ জ্বলে উঠল। তীব্র চোখে লতিফের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওর বাবাও তাই বলে গেলেন। মনে হচ্ছে ওর বাবার কথাই ঠিক। তুমি ওর খবর নাও তো ও কী করে, কোথায় যায়, এসব জেনে আমায় জানাবে। পারবে তো?

লতিফ বলল, 'সেটা আলবৎ পারবো। আপনি হুকুম করলে খবর যোগাড় করতে আর কদ্দিন লাগবে।'

যতীন বলল, 'কিন্তু গোবিন্দ যেন জানতে না পারে। প্রেসের অন্যরাও জানুক এটা আমি চাইছি না।'

লতিফ ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এখন আর গোবিন্দকে নিয়ে ভাববার সময় নেই যতীনের। অতএব, লতিফ চলে যেতেই যতীন রোজকার মতো কাজে ডুবে গেল। কিন্তু চলে গিয়েই লতিফ আবার ফিরে এলো পল্টুকে নিয়ে। যতীন একটু অবাক চোখে তাকাল লতিফের দিকে। লতিফ বলল, 'বড়বাবু, পল্টুটার বোধ হয় কোন

শক্ত ব্যামো হয়েছে। রাতদিন পেটে ব্যথা হয়। তাই আপনার কাছে নিয়ে এলাম।'

মেশিন ঘরেই কাজ করে পণ্টু, যতীন জানে ছেলেটার ইহজগতে কেউ কোথাও নেই। লতিফই ওকে এনে হেলপর হিসাবে কাজে লাগিয়ে দিয়েছে বছর খানেক আগে। রাতে প্রেসেই ওর থাকার ব্যবস্থা। যতীন পণ্টুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যথা হয়তো আমায় বলিস নি কেন? চল, আজকে তোকে বড় ডাক্তার দেখিয়ে দেব। বিকেলে ওকে ছেড়ে দিও লতিফ, ওকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যাব।'

কথা শেষ করেই যতীন কাজ আরম্ভ করল। লতিফ জানতো এরকমই হবে। বড়বাবুকে সে জানে। তার বৌ হাসিনার মতো লতিফও মনে মনে বড়বাবুকে ভাবে পযগম্বর। যেন চারপাশের লোভের নরকে বড়বাবু হঠাৎ গজিয়ে ওঠা একটা ফুল। কম্পোজ ঘরের সুধীর বেরা বলে, 'বড়বাবু হচ্ছে রং ফাউণ্ড। স্মল পাইকার টাইপ ফাউণ্ডের ঘরে হঠাৎ যেন ছত্রিশ পয়েণ্টের একটা বড় মাপের টাইপ। একেবারে বে-মানান। লতিফ তারিফ করেছিল কথাটার। আর ভেবেছিল সেই দিনগুলোর কথা। যখন মা হতে গিয়ে হাসিনা মরতে বসেছিল, তখন খবর পেয়ে রাত দশটায় ছুটে গিয়েছিলেন বড়বাবু। হাসিনাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো, রক্তের ব্যবস্থা করা, দিনে রাতে হাসিনার কাছে আয়া রাখা সবই বড়বাবু নিজে করে দিয়েছিলেন। একটা পয়সাও খরচ করতে হয়নি লতিফকে। সেই কৃতজ্ঞতা লতিফের বুকের মধ্যে পদ্মের মতো ফুটে আছে।

* * *

দুপুরের এই নির্জনতা বড় অসহ্য লাগে উমার কাছে। সকালে অফিস বেরুনোর তাড়া থাকে। সকাল ন'টার মধ্যেই সেটা মিটে যায়। দশটার মধ্যে কেষ্ট গিয়ে সন্টুকে স্কুল থেকে নিয়ে আসে। এগারোটার পর থেকেই সংসারের কাজের তাড়াটা কমতে আরম্ভ করে। তারপর থমথমে দুপুরটা গোটা বাড়ি জুড়ে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। গলির মধ্যে ফেরিওলা হাঁকে 'মাটি চাই মাটি।' কখনো কোন কুলপি বরফওলার লম্বা সুরেলা ডাক, তারপরেই নিঝুম দুপুরের ভারী চেহারা

তাদের উঠোনে থেমে থাকে। সেজোর অবশ্য এসব বালাই নেই। দুপুরের ভাত পেটে পড়লে ওর দু'চোখে ঘুম নেমে আসে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে বুবাইও ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে উঠে স্কুলে যায় বলে সন্টুও দুপুরটা না ঘুমিয়ে পারে না। কিন্তু দুপুরে ঘুমের অভ্যেস নেই উমার। কখনও রেডিওতে গান শোনে, কখনও এটা-ওটা সেলাই করে, কিংবা হাতের কাছে কোন বই-টই পেলে তার পাতা খুলে কিছু কিছু পড়ে। বড় রাস্তা থেকে ছুটে আসা গাড়ির হর্ন, কোন চলমান মিছিলের শ্লোগান, কদাচিৎ কোন গাড়ির টায়ার ফাটার বিকট আওয়াজ, কখনও কখনও অসাড় দুপুরটাকে ঈষৎ চঞ্চল করে দিয়েই আবার মিলিয়ে যায়।

আজও তেমনই একটা দুপুর উমার। একটু আগে মাটিওলাও গলিতে হাঁক দিয়ে চলে গেছে। নিচের রাস্তায় কয়েকটা বাচ্চা ছেলের কলরব ছিল, সেটাও থেমে গিয়ে এখন পাড়া শান্ত। ঘরের মধ্যে গুমোট গরমটা দুপুরের সঙ্গে সঙ্গে যেন আরও তেতে উঠছে। উমা পাখার স্পীডটা বাড়াবার জন্যে রেগুলেটারে হাত রাখল, আর ঠিক তখনই দরজার কলিং বেলটা পর পর দু'বার বেজে উঠে থেমে গেল। এমন অসময় কে এল, কে আসতে পারে, ভাবতে ভাবতে উমা দোতালায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেলিং-এর ওপর ঝুঁকে পড়ে নিচের সদর দরজার দিকে তাকাল। কেষ্ট দরজা খুলে দিচ্ছে। দরজাটা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কেউ ভেতরে এলনা। ওপর থেকে উমার মনে হল কেউ যেন বাইরে দাঁড়িয়ে কেষ্টর সঙ্গে কথা বলছে। উমার কৌতুহল বাড়তে লাগল। ওপর থেকে কেষ্টকে ডাকতে যাচ্ছিল উমা, কিন্তু ডাকতে হল না। সদর দরজা পেরিয়ে ভেতরে এলো দীপু, তার পেছন পেছন একটি মেয়ে। কৌতূহল আর বিস্ময় এবার উমার চোখের তারায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। সতেরো কিংবা আঠারো এই রকমই বয়স হবে মেয়েটির। টকটকে ফর্সা রং, পরনে একটা জমকালো প্রিন্টেড শাড়ি হাতে বইখাতা দেখে মনে হয়, মেয়েটি কলেজ থেকে আসছে। উমা নিজেকে একটু আড়াল করে দাঁড়াল। মনে মনে ভাবল, এই ভর দুপুরে এমন সুন্দরী অষ্টাদশীকে দীপু কোত্থেকে জোটাল। উমা

'আড়াল থেকে দেখল, ওরা হু'জন দিব্যি সচ্ছন্দে নীচু গলায় কথা বলতে বলতে দোতালার সিঁড়ির দিকে হেঁটে আসছে। উমা বুঝতে পারল না মেয়েটি কে। কৌতূহল চেপে রেখে সে দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরেই ওরা ওপরে উঠে এসে ঢুকল সোজা উমার ঘরে। উমা ওদের দিকে ইচ্ছে করেই এত স্বাভাবিক ভাবে তাকাল যাতে মনেই হল না ওব মনের মধ্যে বা ওর তাকানোর ভেতর কোন কৌতূহল আছে। শুধু দীপুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এত সকাল-সকাল ফিবলে যে। অফিস যাওনি?'

দীপুব মুখে এবার একটু সলজ্জ হাসি ফুটল। ভঙ্গিটা আড়ষ্ট কিন্তু দীপু সেটাকে সামলে নেবার জন্যে চটপট বলে উঠল, আজ একটা সি-এল মেরে দিলাম। আসলে তোমাকে আমাদের একটু নিবিবিলি পাওযা দরকাব। আব তাব জন্যে হুপুরটাই হচ্ছে আইডিয়াল।'

উমাব সন্দেহটা এতক্ষণে একটা বিশ্বাসেব চেহারা নিল। সে মনে মনে যা আঁচ করেছিল, দীপুর মুখে 'আমাদেব' শব্দটা উচ্চারিত হতে শুনে সে প্রায় নিশ্চিত হয়ে গেল। ব্যাপাবটা ধবতে পেবে উমার মজা লাগছিল। সে বিস্ময়ের ভান করে বলল, 'তবে তো দবকারটা খুব জরুরী মনে হচ্ছে দীপু। তা দরকাবী কথা না হয শোনা যাবে, কিন্তু তার আগে তোমরা বসবে তো।'

শেষের কথাটুকু মেয়েটিকে লক্ষ্য কবেই বলল। দীপু এবাব এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'বসার আগে ওব পবিচয়টা তোমায় দিয়ে নি। ওব ডাক নাম ঝুমা, ভালো নাম সুদেষ্ণা। বেথুনে পার্ট-টু পড়ছে। আমার বান্ধবী। আপাতত এইটুকু শুনে রাখো, বাকিটা পবে বলব।'

কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে গেল দীপু। উমা ঠোঁট-টিপে একটু হাসল, তাবপর ঝুমার হাতটা টেনে নিয়ে বলল, 'এসো বসো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা হয়।'

ঝুমাকে অবশ্য ততটা আড়ষ্ট মনে হচ্ছে না, যতটা মনে হচ্ছিল দীপুকে। ঝুমা খাটে বসতে যাবার আগে উমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে টিপ করে উমাকে একটা প্রণাম করল। ঝুমা পা ঝুলিয়ে খাটে বসল। উমা এই ফাঁকে ঝুমাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কনে দেখার মতো

আরও একবার দেখে নিয়ে মনে মনে বলল, 'না, দীপুর পছন্দ আছে।'

ঝুমা বলল, 'ভর দুপুরে এসে আপনাকে জ্বালালাম তো!'

উমা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না ভাই, ঠিক তার উল্টো। দুপুরে আমার ঘুম আসে না। তাই দুপুরটা আমার কাটতেই চায় না। এ সময় কথা বলার লোক পেলে বেঁচে যাই।

ঝুমার দু'চোখে খুশি ঝিলিক দিয়ে উঠল, 'আঃ কী দারুণ! ঠিক আমার মতো। আমিও দুপুরে একদম ঘুমোতে পারি না। দুপুরে ঘুমোলেই আমার রাতের ঘুমের বারো বেজে যায়।'

উমা দীপুর দিকে চোখ রেখে বলল, 'তুমি তো নিশ্চয়ই ঝুমাকে বেথুন থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছো। ওর নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে না থেকে দোকানে যাও।'

দীপু কিছু বলতে যাচ্ছিল তার আগেই ঝুমাই দু'হাত তুলে বলল, 'না-না বৌদি, কিছু খাব না। ও-পাঠ চুকিয়ে এসেছি। ও তো রাস্তায় বেরুলেই খাই-খাই করে। একেবারে পেটুক গোঁসাই।'

কথাটা বলেই ঝুমা আড়চোখে দীপুর দিকে তাকাল। দীপু ড্রেসিং টেবিলের সামনের থেকে টুলটা টেনে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'যত দোষ আমার নামে। বসন্ত কেবিনে কে টেনে নিয়ে গিয়েছিল? পুরো একখানা মোগলাই সেঁটেছে বৌদি, পেটে আর খিদে থাকে!'

উমা ওদের লক্ষ্য করেছিল। বিশেষ করে তার চোখ ছিল ঝুমার ওপর। ঝুমার এক হাতে ঘড়ি, অন্য হাতে একটা রুপোর বালা। লম্বা বিনুনী পিঠ ছাড়িয়ে খাট ছুঁয়ে আছে। ছোট্ট চাপা কপাল, টিকলো নাকের পাশেই ছোট্ট একটা তিল। চোখে পড়বার মতো চেহারা ঝুমার। বিয়ের পর মুটিয়ে না গেলে এমন বৌ গর্ব করে দেখাবার মতো। কথা বলতে বলতে যখন ওর নাকটা একটু ফুলে ওঠে কিংবা লজ্জা পেয়ে মুখ টিপে যখন হাসে, তখন ভারি মিষ্টি দেখায় ওকে।

উমা ওদের থামিয়ে দিয়ে বলল, 'তাহলে একটু পরে চা খাবে, নাকি তাও খেয়ে এসেছ?'

দীপু উঠে দাঁড়িয়ে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট

টেনে বার করে বলল, 'চা-তো নিশ্চয়ই খাব, যতবার দেবে ততবার খাব।'

দীপুকে সিগারেট ধরাতে দেখে ঝুমা চোখ পাকিয়ে শাসন করার ভঙ্গিতে দীপুর দিকে তাকাল। দীপু ঝুমার তাকানোর অর্থটা বুঝতে পেরে বলে উঠল, 'চোখ পাকাচ্ছো যে বড়, আমি তো বৌদিদের সামনেই খাই। আমার পারমিশন নেওয়া আছে। আমার বার্থডে-তে এই বৌদি আমাকে ইণ্ডিয়ান কিংস প্রেজেণ্ট করে। তুমি তো স্রেফ গোল্ড ফ্লেক।...

আচমকা কথাটা বলেই জিভ কাটল দীপু। উমার দু'চোখ খুশিতে ভরে আছে। সে বলল, 'না-না, লজ্জা পাবার কিছু নেই। বার্থডে বলে কথা, বান্ধবী যদি কিছু দেয় তাতে লজ্জার কি আছে।'

ঝুমার মুখ লাল হয়ে গেল। নিজেকে সামালাবার জন্যে ঘাড় ঘুরিয়ে কপট রাগের ভঙ্গিতে বলল, 'লক্ষ্য করেছেন বৌদি, ওর মুখে শুধু খাওয়ার কথা।'

উমাও একটু অসহায় ভঙ্গি করে বলল, 'কি আর করবে বল, এই বয়সে ছেলেদেব একটু খাই-খাই বাতিক থাকে। একটু মানিয়ে নাও ভাই।'

ঝুমা আরও লজ্জা পেয়ে মাথা নামাল। দীপু তুড়ি দিয়ে সিগা-রেটের ছাই ঝেড়ে বলল, 'দারুণ বাউনস দিয়েছ বৌদি, ঝুমা একেবারে বোল্ড আউট হয়ে গেছে।'

উমা এবার খাট থেকে নেমে পড়ল। ঝুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা বসো, আমি কেষ্টকে চায়ের জল চাপাতে বলে আসি। আসবার সময় সেজোকেও ডাকবো নাকি!'

শেষের প্রশ্নটা উমা দীপুর দিকে তাকিয়ে দীপুকেই করল। দীপু বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'এখন না! সেজবৌদি বড্ড তড়বড় করে। হয়তো চেম্বারে ফোন করে সেজদাকে এখনই জানিয়ে দেবে।'

উমা হাসতে হাসতে বাইরে চলে গেল। ঝুমা চাপা স্বরে বলল, 'তুমি ভারি অসভ্য। আসল কথা কিছুই হচ্ছে না, খালি ফাজলামো।'

দীপু একই ভাবে জবাব দিল, তোমার যেমন বুদ্ধি, সব কথা কি

আজই বলা যায় নাকি? আজ শুধু নেট প্র্যাকটিস। আসল গেম পরে।'

ঝুমা পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'তোমরা আসল গেম শুরু হবার আগেই আমার বাবা জুট টেকনোলজিস্টের-এর বাবাকে কথা দিয়ে গেম ফাইনাল করে ফেলবে।'

দীপু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'আরে রাখো তোমার জুট টেকনোলজিস্ট। ব্যাঙ্কের পরীক্ষায় পাশ করে দু'দিন পরে আমিও ব্যাঙ্কের অফিসার হয়ে যাব। আসলে মেজবৌদিই হচ্ছে সব। মেজদা সেজদা কোন ফ্যাক্টর নয়। বড়দা রাজী হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আর বড়দাকে রাজী করানোটা মেজবৌদি ছাড়া আর কারো দ্বারা হবে না।'

ঝুমা একটু গম্ভীর হল। গলাটা ভারি করে বলল, 'তোমার বড়দা রাজী হবেন না এমন ভাবছ কেন?'

দীপু সিগারেটটা ছাইদানিতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'বড়দা সেকেলে লোক, ঘোরতর আস্তিক আর প্রচণ্ড কনভেনশনাল। এই ইনটারকাসট ম্যারেজটা বড়দা কী ভাবে নেবেন সেটার ওপরেই সব কিছু নির্ভর করছে।'

ঝুমা আগের মতো গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, 'যদি রাজী না হন?

দীপু ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলল, 'তাহলে খুবই সংকট। সেজন্যেই মেজবৌদিকে ধরেছি।'

ঝুমা খর দৃষ্টিতে দীপুর দিকে তাকাল। তার বুকের মধ্যে অপমানের হলকা বইছে। কণ্ঠস্বরে সেই আগুন উগরে দিয়ে সে বলল, 'আমাকে ভালবাসবার আগে আমার জাত পাতের ঠিকুজী নিয়ে বড়দার পারমিশন নিলেই পারতে।'

দীপু চমকে উঠে দেখল ঝুমা খাট থেকে নেমে এসেছে। অপমানে আর উত্তেজনায় থমথম করছে ঝুমার মুখ। দীপু এতটা ভাবেনি। দরজার দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে দীপু ফিরে এল। ঝুমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তোমায় ঠিক বোঝাতে পারব না, আমাদের সংসারে এবং আমাদের জীবনে বড়দা কি এবং কতখানি।

আমাদের মানুষ করবার জন্যে বড়দা নিজের সর্বস্ব দিয়েছে। আমাদের ভরা সংসারে বড়দা একজন সন্ন্যাসী। বলতে পারো, এ বাড়ির প্রত্যেকের কাছেই ওই মানুষটা একটা জীবন্ত বিগ্রহ। সে না চাইলে আমরা এমন কিছু চাইতে শিখিনি যাতে ওই বিগ্রহের মনে ব্যথা লাগে।'

আবেগে গলা বুঁজে এল দীপুর। বাইরে জানালার দিকে মুখ রেখে সে বলল, 'বারো বছর বয়স পর্যন্ত ওই বড়দার বুকেই আমি ঘুমিয়েছি। এখনও বাবার কথা মনে পড়লে আমার স্মৃতিতে বড়দাকেই দেখি, বাবাকে আমার মনে পড়ে না।'

ঝুমার রাগটা ফিকে হয়ে এল। দীপুর কণ্ঠস্বরে এমন একটা আবেগ ছিল যা ঝুমাকে স্পর্শ করল। ঝুমা অবাক চোখে দেখল দীপুর চোখ ভিজে উঠেছে। সে প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল টেনে নিল। ঝুমা আস্তে আস্তে খাটের কাছে ফিরে এল। তার মনের ভেতরটা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। রাগ কিংবা অপমানের চাইতেও বড় হয়ে উঠেছিল একটা অচেনা যন্ত্রণা। ঝুমা টের পেল, তার মন মেঘলা আকাশের মতো আস্তে আস্তে ভারী এবং বিষণ্ণ হয়ে উঠছে। দরজার গোড়ায় মেজবৌদির কণ্ঠস্বর। ঝুমা নিজেকে চট করে বদলে নেবার জন্যে খাটের কাছ থেকে দ্রুত সরে গিয়ে খোলা জানালার সামনে দাঁড়াল।

বাইরে তখন ফুরিয়ে আসা দুপুরের ছবি। মেঘলা আকাশের নিচে অবিন্যস্ত কলকাতার কোলাহল।

॥ ৩ ॥

তালতলার চেম্বারে বসে রোগী দেখছিল বীথিন। বাইরের ঘরে ভিড়। একজন করে রোগী বেরিয়ে যেতেই কমপাউণ্ডার সুধাময় স্লিপ দেখে ডাক দিচ্ছিল, আর সেই মতো বীথিনের ঘরের কাটা দরজা ঠেলে রোগীরা ঢুকে যাচ্ছিল। বীথিন মুখ তুলেই দেখল বড়দা তার সামনে দাঁড়িয়ে, হাতে একটা স্লিপ, মুখে চাপা খুশির আভাস। বীথিন

অবাক হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'দাদা! তুমি এখানে কেন?'

যতীন সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'তোর কাছে এই পল্টুকে নিয়ে এলাম। ছেলেটা আমার ওখানে কাজ করে। ওকে একটু ভাল করে দেখে দে।'

বীথিন বসতে বসতে বলল, 'তুমি এসেছ কখন?'

যতীন ঘরের চারদিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে বলল, 'তা ঘণ্টাখানেক হবে।'

বীথিন অসহায় ভঙ্গিতে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'আচ্ছা লোক তো তুমি। এক ঘণ্টা আগে এসে স্লিপ দিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে আছ। সরাসরি চলে এলে না কেন?'

যতীন প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠল, 'কেন আসব? যারা আমার আগে এসেছে তাদের ডিঙ্গিয়ে আসাটা অন্যায় হতো না! তোমার চেম্বারে আমিও যা আর দশজন রোগীও তাই।'

বীথিন বুঝল এ ব্যাপারে বড়দার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা। হাজার যুক্তি দিয়েও এই মানুষটাকে তার বিশ্বাস থেকে নড়ানো যাবে না। বীথিন পল্টুকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। পল্টুকে টেবিলের ওপর শুইয়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে যাবার আগে বড়দার দিকে তাকাল। বড়দার হাতে স্লিপটা তখনও ধরা। তার মানে এখানে আসবার আগে সুধাময়কে অন্যান্য রোগীদের মতো বড়দাও ষোল টাকা ফিস দিয়ে এসেছে। পল্টুর পেটের ওপর থেকে জামাটা সরাতে সরাতে বীথিন বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই কমপাউণ্ডারের টেবিলে আসার সময় ষোল টাকা দিয়ে এসেছ?'

বড়দা ছেলে মানুষের মতো হাসতে হাসতে বীথিনের দিকে মুখ ফেরাল। বলল, 'জানিস বীথি, তোর কমপাউনডার যখন বলল, ষোল টাকা দিন, তখন টাকাটা দিতে গিয়ে আনন্দে আমার বুক ভরে গেল। মনে হল এই সেই বীথি, যে অনেক বয়স পর্যন্ত মাছের কাঁটা বেছে খেতে পারত না। আমি ওর মাছ বেছে দিতাম, যে ছোটবেলায় বাজ পড়ার আওয়াজ শুনলে আমার বুকে মুখ লুকিয়ে থাকত,

সোদনের সেই ভাইটাই এখন ডাঃ বি. ঘোষ।

রোগী দেখা শেষ করে বীথিন নিজের চেয়ারে ফিরে আসতে আসতে বলল, 'তোমার আনন্দ হয়েছে, কিন্তু আমার কষ্ট হচ্ছে এই ভেবে যে, তুমি আমার কাছে রোগী দেখাতে এলে ফিস দিয়ে।'

কথা শেষ করেই বীথিন ডাক দিল, 'সুধাময়বাবু!'

বাইরে বসা মাঝবয়েসী লোকটা এবার ঘরে এল। বীথিন যতীনের দিকে দেখিয়ে বলল, 'চিনে রাখুন, ইনিই আমার বড়দা। আর ওঁর টাকাটা ফেরৎ দিয়ে যান।'

যতীন যেন ফুঁসে উঠল, 'কেন, ফেরৎ দেবে কেন? যেখানকার যা নিয়ম তা মানতে হবে না! আমিও তো তোর লেটারপ্যাড ছেপে দিয়ে দাম নিয়েছি, নেই নি! তাছাড়া টাকাটা তো এক বাড়িতেই যাবে।'

বীথিন আর তর্ক বাড়াল না। ইশারায় সুধাময়কে চলে যেতে বলে বড়দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরবে তো, তাহলে একটু বসো একসঙ্গে যাবো।,

পল্টুর জন্য প্রেসক্রিপশন লিখে বীথিন সেটা সুধাময়ের হাতে দিয়ে বলল, 'ট্যাবলেটগুলো আমার এখান থেকে দিয়ে দিন।'

যতীন ভায়ের দিকে তাকিয়েছিল। এবার বলল, 'কিন্তু ওর অসুখটা কি?' বীথিন মাথা নেড়ে জবাব দিল, তেমন সিরিয়াস কিছু নয়। উইণ্ড থেকে এসব হচ্ছে।'

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কাজ মিটিয়ে ফেলল বীথিন। নিজের গাড়িতে বসে স্টার্ট দেবার আগে যতীন বলল, 'তুই তো বেশ তাড়াতাড়ি রোগী দেখতে পারিস। সব ঠিক-ঠাক দেখিস তো?'

বীথিন একবার কোন উত্তর না দিয়ে শুধু হাসল। হাসিটার অর্থ ধরতে পারল না যতীন। বীথিন গাড়ি চালাতে আরম্ভ করে দিল। খানিক আগে এক পশলা তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেছে। কলকাতার রাস্তায় সেই জল দাঁড়িয়ে আছে জায়গায় জায়গায়। গাড়িটা চলতে শুরু করতেই আবার ঝির-ঝির করে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। জানালার কাঁচ তুলে দিতে দিতে যতীন দেখল কলকাতার আকাশ

ক্রমশ সিসের মতো হয়ে উঠছে। প্রেস থেকে বেরুবার সময় আকাশে দু'একটা তারা ছিল। এখন গোটা আকাশটা অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। গাড়ির সামনের কাঁচে ঝির-ঝির করে জল গড়িয়ে পড়ে কাঁচটাকে ঘোলাটে করে দিচ্ছিল। বীথিন বাঁ-হাতে একটা ন্যাকড়া নিয়ে কাঁচটা মুছে দিল। যতীন বলল, 'তোর ওয়াইপার নেই?'

বীথিন ন্যাকড়াটা রাখতে রাখতে জবাব দিল, 'আছে, কিন্তু ও দুটো ফাংশন করছে না। বর্ষা এসে গেল, ভাবছি এবার ঠিক করে নেব।'

যতীনের গলায উদ্বেগেব ছোঁয়া লাগল, 'সেকি! তুই কালই ওটা ঠিক কবে নে। যদ্দিন ঠিক না হচ্ছে তদ্দিন গাড়ি নিয়ে তোকে বেরোতে হবে না। বৃষ্টিব মধ্যে সামনেটা ঝাপসা হয়ে গেলে তো একটা কাণ্ড বাঁধিযে বসবি।'

বীথিন গাড়ি চালাতে চালাতে এই সময সামনেব একটা টেম্পোকে দ্রুত পাশ কাটিযে এল আব তখনই বীথিনের ফিয়াটের গায়ে হাওয়া লাগিয়ে ডান পাশ দিয়ে একটা মিনিবাস বেপরোয়া ভঙ্গিতে পাশ কাটিযে বেরিয়ে গেল। নিজের সিটের ওপব বসে প্রায় আর্তনাদের গলায় যতীন বলে উঠল, 'আজ একটা কাণ্ডই বাধাবি তুই। জলের রাস্তায় একটু ধীরে সুস্থে চালালে ক্ষতি কি? আমরা তো আগুন নেভাতে যাচ্ছি না।'

বীথিন নির্বিকার ভাবে উত্তর দিল, 'ভুলটা তো করলো ওই মিনি বাসওলা, ওভাবে কেউ ওভারটেক করে?'

যতীনও বলে উঠল, 'তুই-ই বা কোন কম্মে টেম্পোটাকে ওভারটেক করতে গেলি?'

বীথিন এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'ওই শামুকটার পেছন পেছন গেলে বাড়ি পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যাবে।'

যতীন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'না না, এ কোন কাজের কথা নয়। ডাক্তার তুই যতই ভালো হোস, ড্রাইভার ভালো না। বড্ড বাজে চালাস। তুই যে কোন দিন একটা অ্যাকসিডেন্ট বাধিয়ে ছাড়বি। এসব

ব্যাপার তো আমার মোটেও ভাল লাগছেনা বীথি।'

ততক্ষণে বীথিনের গাড়ি একটা প্রাইভেট বাসের পেছনে এসে পড়েছে। বড়দা না থাকলে অনায়াসেই ওভারটেক করা যেত। কিন্তু এখন আর সে উপায় নেই। অতএব, বাসটাব পেছন পেছন লাইন ধরে বীথিন চলতে লাগল। বাসটা একটু যায়, আবার থামে, লোক ডাকে আবার একটু এগিয়ে গিয়ে থেমে যায়। অতএব বীথিনাকেও থামতে থামতে যেতে হয়। তার ডানপাশ দিয়ে ট্যাক্সী, প্রাইভেট-কাব হুস্ হুস্ কবে বেবিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা বীথিনের কাছে খুবই বিরক্তিকর, তবুও বড়দার জন্যে তাকে মেনে নিতে হচ্ছে। কিন্তু এক সময় থাকতে না পেরে বীথিন বড়দাকে বলল, 'দেখছো তো অবস্থাটা। হেঁতুয়া পর্যন্ত এই কবতে কবতে যাবে। এখনও কী তুমি বলবে ওভারটেক না কবে ওর লেজুড় হয়ে যাবো?

বডদা গম্ভীর গলায় উত্তর দিল, 'তাই তো নিয়ম। তুই আগে এলে আগে থাকতিস, ও তোব পেছনে থাকতো। বর্ষা-বাদলার দিনে তায় আবাব বাত্তিব বেলা এসব রিসক না নেওয়াই ভালো।'

বীথিন একটু অসহিষ্ণু হল। গলায় চাপা বিরক্তি ফুটল তার। বলল, 'কিন্তু এভাবে গেলে পৌছব কখন?'

যতীন হাসল। হাসিটা তার মুখের ওপর কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে থাকল। তারপর বলল, পৌছনোটা খুবই জরুরী বীথি, কিন্তু তার তার চাইতেও জরুরী তুই কেমনভাবে পৌছচ্ছিস, কোন পথে পৌছচ্ছিস। শেষের কথাটাই আসল।

বড়দার কথা বলার ধরেন, প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণে এবং কণ্ঠস্বরে এমন একা আচ্ছন্নতা ছিল যাতে বীথিনের মনে হল এই বড়দা যেন এখন অনেক দূর থেকে কথা বলছে। যেখান থেকে এই কথাগুলি উচ্চারিত হয় সেখানটায় বীথিনের গাড়ি কোনদিনই পৌছয় না। বীথিন চুপ করে থাকলো। মাঝে-মধ্যে বড়দাকে তার বড় অচেনা মনে হয়। যেন সমুদ্রের ঢেউ ছুঁয়ে ছুটে আসা বাতাসের মতো বড়দা খুব কাছে থেকেও নাগালের বাইরে চলে যায়। নিঃশব্দে খানিকটা পথ আসবার পর বীথিনের মনে হল, এখন, এখানে এই গাড়ির মধ্যে

সেই কথাটা বড়দাকে বললে কেমন হয়! বাড়িতে বড়দাকে তো একা পাওয়াই যায় না। অথচ বড়দাকে না বললেই নয়। নিজের মনেই কথাটাকে নিয়ে বার কয়েক লোফালুফি করল বীথিন। তারপর এক সময় বলল, 'বড়দা, তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল। ক'দিন থেকেই বলবো বলে ভাবছি।'

যতীন বাইরে তাকিয়ে ছিল। বীথিনের দিকে মুখ ফেরাতে ফেরাতে বলল, 'কী কথারে?'

বীথিন বলল, 'কথা মানে, একটা ডিসকারশন, মানে একটা সাজেসন চাই আরকি!'

যতীন তাড়া দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'তা বলনা, কথাটা কি।'

বীথিন সামনের কাঁচটা আরেকবার মুছে নিয়ে বলল, 'দিনকাল যা পড়েছে বড়দা, তাতে এভাবে লোকের নাড়ি টিপে টিপে খুব বড় একটা কিছু করা যাবে না। আমার বহুদিনের ইচ্ছে নিজে একটা নার্সিং হোম করি। নাগেরবাজারের কাছে একটা জায়গাও পাওয়া যাচ্ছে।

যতীন এবার বীথিনের দিকে ঘুরে বসে বলল, 'এতো বেশ ভালো কথা। কিন্তু জমির দাম-টাম কেমন?'

বীথিন নিজের গলার টাইটা বাঁ হাত দিয়ে একটু ঢিলে করে দিতে দিতে বলল, 'শুধু জমির দাম হলেই তো চলবে না। কনস্ট্রাকশনের খরচ আছে, মেডিক্যাল অ্যাপারেটার্স কেনা আছে, তারপর ধর কিছু স্টাফ রাখতে হবে, এ ছাড়াও ফর্নিচার, পেসেন্ট বেড এগুলো তো আছে।'

যতীনকে এবার চিন্তিত দেখল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে লাগল। বীথিন দাদা চিন্তিত মুখটা দেখল। যতীন যেন নিজের মনেই বলতে লাগল, 'তবে তো অনেক টাকার ব্যাপার। এত টাকা পাওয়া যাবে কোত্থেকে?'

বড়দার চিন্তিত মুখটা এই মুহূর্তে বীথিনকে ভেতরে ভেতরে সুখ দিল। সে বোধহয় এমনটাই চেয়েছিল। বীথিন মিনিট খানেক চুপ করে থেকে বলল, 'টাকা পয়সার একটা হিসেব আমি করেছি

বড়দা। ওটা খুব একটা প্রোবলেম হবে বলে মনে হয় না।'

যতীন তার বিস্মিত দুই চোখ তুলে ভাইয়ের দিকে তাকাল। অবাক গলায় প্রশ্ন করল' 'তাহলে সমস্যাটা কোথায়? টাকার ব্যবস্থাটাই তো আসল।'

বীথিন জবাব দেবার আগে ইচ্ছে করেই একটু সময় নিল। তারপর স্টীয়ারিংটা আস্তে করে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'আমার নিজের কিছু সামান্য জমানো টাকা আছে আর বাকিটা...'

কথাটা শেষ করতে পারল না বীথিন। মাঝ রাস্তার ওপর লাল লণ্ঠন বসিয়ে কর্পোরেশনের লোকেরা ম্যানহোল খুলে কাজ করছিল। তার পাশে কয়েকটা বাচ্চা ছেলে ঝির ঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে খোলা ম্যানহোলের চারপাশে ছোটাছুটি করছে। সম্ভবত ফুটপাথের বাসিন্দাদের ছেলে' রাস্তার ওপর লাল আলো, উন্মুক্ত ম্যানহোল আর কয়েকটি ভিখেরী বালকের বিশৃঙ্খল ছোটাছুটির ফলে হঠাৎ ব্রেক কষতে হল বীথিনকে। জায়গাটা আস্তে আস্তে পেরিয়ে আসার পর যতীন খানিক আগের কথার খেই ধরে বলল' 'বাকিটা?'

বীথিন একটু কাশল। কেশে নিয়ে বলল, 'বাকিটা শ্বশুর মশাই দিতে চাইছেন। উনি নিজেই জয়ন্তীকে বলেছেন।'

অন্ধকার আকাশে গুড় গুড় করে মেঘ ডাকল। যতীন একবার বীথিনের দিকে তাকাল তারপর সামানের বৃষ্টিভেজা রাস্তার দিকে দেখতে দেখতে বলল, 'তোর জমানো টাকা কত তা আমি জানিনা' তবে অতগুলো টাকা শ্বশুরের কাছ থেকে নেওয়া আমার ভালো লাগছে না। তুই নার্সিং হোম কর এটা আমিও চাই' কিন্তু তার জন্যে শ্বশুরের দ্বারস্থ হওয়াটা আমার পছন্দ নয়।'

বীথিন সামানের রাস্তায় চোখে রেখেই বলল, 'এর মধ্যে তো কোন অন্যায় নেই বড়দা। আমি না হয় লোন হিসেবে নেব।'

সিটের পেছনে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে যতীন চোখ বুজল। সেই ভাবেই বলল, 'তুই তো এখন খুব খারাপ নেই বীথি, মোটামুটি ভালই রোজগার করিস। আরও যদি কিছু করতে চাস তাহলে সেটা নিজেদের শক্তিতেই করা ভালো। আত্মীয়-কুটুমের কাছে হাত

পাতলে জিনিসটা ভালো দেখায় না।'

বীথিনের গলায় সামান্য বিরক্তি প্রকাশ পেল, 'আহা, তুমি বার বার এটাকে হাতপাতা মনে করছ কেন? লোক তো ব্যাঙ্ক থেকেও লোন করে, আমি না হয় শ্বশুরের কাছ থেকে লোন করছি, এর মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? তুমি প্রেস করাবার সময় ব্যাঙ্ক থেকে লোন নাওনি?'

যতীন চোখ খুলে বীথিনের মুখটা দেখল। বীথিন সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে। যতীন ক্লান্ত গলায় বলল, 'নিয়েছিলাম। পৈতৃক বাড়িটাও সে জন্য ব্যাঙ্কের কাছে মর্টগেজ আছে। আমি যেটা করেছি সেটা স্বাভাবিক আইনানুগ ব্যাপার। এর মধ্যে কোন পক্ষের বিন্দুমাত্র অনুগ্রহ বা দয়া দেখাবার প্রশ্ন নেই। কিন্তু তোর বিষয়টা এই পর্যায়ে পড়ে কি?'

বড়দার কথার মধ্যে একটা চাপা উত্তাপ টের পেল বীথিন। যেন এই মুহূর্তে সেটা একটা হালকার মতো বীথিনের শরীরে ছড়িয়ে গেল। বীথিন আহত অভিমানে চাপা গলায় বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই পড়ে, কিন্তু তুমি পড়তে দিতে চাইছো না। এখন তো আর ইচ্ছে করলেও আমার পক্ষে বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা পাবার উপায় নেই—সে পথ তুমি বন্ধ করে রেখেছ।'

হেঁতুয়ার মাথার ওপর প্রচণ্ডশব্দে বাজ পড়ল। নীলচে আলোয় গোটা পার্কটাকে এক পলকের জন্যে ঝলসে দিয়ে আলোটা মিলিয়ে যেতেই কানে তালা লাগানো শব্দটা আছড়ে পড়ল। যতীন দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরল। শব্দটা মিলিয়ে যাওয়ার পরও যতীন হাত নামাল না।

ছিদাম মুদী লেনের গলিতে যখন গাড়িটা ঢুকছিল বীথিন তখন শুনল অনেক কাল আগের মতো গলায়, যখন বড়দা তারপাশে শুয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাকত, বীথি, ঘুমোলি? ঠিক সেই রকম ঠাণ্ডা সুরে বড়দা বলছে, 'বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে যে টাকা পেয়েছিলাম সেই টাকায় কি তোর নার্সিং হোম হয় বীথি?

বীথিন একথার উত্তর দিতে পারল না।

উত্তরটা যেন জয়ন্তীর জিভের ডগায় আটকে ছিল। স্বামীর দিকে মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'কেন হবে না। বাড়ি মর্টগেজ দিয়ে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে বড়দা যেটাকা পেয়েছে তাতেই তো নতুন মেশিন, ছাপবার আরও কি সবযন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। টাকা যে আসলে কত পেয়েছেন সে কথা তো বড়দা আজও ভেঙ্গে বলেন নি কাউকে।'

ব্লাউজটা খুলতে খুলতে জয়ন্তী চাপাস্বরে কথাগুলো উগরে দিয়ে আয়নার ভেতর দিয়ে স্বামীর দিকে তাকাল। সোফায় বসে সিগারেট খাচ্ছিল বীথিন। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর দিল না। সে মনে মনে ভাবছিল, বাড়ি মর্টগেজের কথাটা ওভাবে বড়দাকে না বলাই উচিত ছিল। জীবনে কোনদিন বড়দার সঙ্গে এভাবে কথা বলেনি বীথিন। মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করছিল স!

চুল বাঁধা হয়ে গিয়েছিল জয়ন্তীর। এবার আঙ্গুলের ডগায় ক্রিম তুলে নিয়ে গালে ঘষতে ঘষতে আবার বলল, 'আমার বাবার তো ভারি দায় পড়েছে দোরে দোরে ঘুরে সবাইকে দয়া দেখাবার।'

অ্যাসট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বীথিন বলল, 'টাকাটা শ্বশুরের বলেই বলেই বড়দা হয়তো আপত্তি করছে।'

চোখের কোনে আলতো করে ক্রিমের প্রলেপ টেনে দিতে জয়ন্তী বলল' 'তাহলে তোমার বড়দাকে বলনা টাকাটার ব্যবস্থা করতে।'

বীথিন নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'অতটাকা বড়দা কোথায় পাবে?'

জয়ন্তী ঘুরে দাঁড়িয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। তার সারা মুখে চাপা রাগ। রাগটা গোপন করল না জয়ন্তী। সেই গলাতেই বলল, 'বড়দা দিতেও পারবেন না, নিতেও দেবেন না-এতো ভারি অদ্ভুত ব্যাপার। তুমি নিজে একটা নার্সিং হোমের মালিক হও এটা কি বড়দা চান?'

বীথিন সিগারেট টা অ্যাসট্রেতে গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'সেটা কেন চাইবেন না। বড়দার কাছে লক্ষ্যটা বড় নয়, লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথটাই বড় কথা।'

শব্দ করে ড্রয়ারটা বন্ধ করল জয়ন্তী! আঁচলটা টেনে পিঠের

ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে বুকের কাছ পর্যন্ত টেনে এনে বলল, 'তাহলে তোমার বড়দাকেই বল, তোমার পথটা ঠিক করে দিতে। আমি বরং বাবাকে টেলিফোনে বারণ করে দিচ্ছি।'

জয়ন্তীর মুখটা ঘরের হালাকা আলোয় চকচক করছিল! নাকটা কথা বলার সময় বার দুই ফুলে উঠল। পাতলা কাপড়ের নিচে শঙ্খের মতো সাদা বুক জোড়া উদ্ধত। বীথিন সোফায় বসে হাত বাড়িয়ে জয়ন্তীর একটা হাত ধরল। জয়ন্তী যেমন ছিল তেমনই দাঁড়িয়ে থাকল। বীথিন একটু জোর দিয়ে টানতেই জয়ন্তী সোফার কাছে সরে এল। বীথিন নিজের শরীরে একটা তাগিদ অনুভব করছিল। সে দু'হাতে জয়ন্তীকে বুকের কাছে টানল। জয়ন্তীর মুখে এখনও চাপা রাগ এবং অভিমান। বীথিন বলল, 'তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? একটু ভেবে দেখিনা।'

জয়ন্তার গলায় অভিমান গাঢ় হল। বীথিনের বুকের ওপর আঙ্গুল দিয়ে আঁকিবুঁকি কাটতে কাটতে বলল, 'তুমি আর ভাববে কি' বড়দা যেমন ভাবাবেন তেমনই তো ভাববে।'

বীথিন কথা বললনা জয়ন্তীর গলার কাছে মুখটা ঘষতে ঘষতে বুঝতে পারল জয়ন্তীর শরীর আবেগে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে।

ঠিক তখনই দরাজায় ঠকঠক করে শব্দ উঠল। সেই সঙ্গে বড়দার গলা শুনতে পেল বীথিন, 'বীথি কি ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি?'

গায়ের ওপর আঁচল টেনে দিয়ে জয়ন্তী তাড়াতাড়ি সোফা থেকে উঠে খাটের কোনায় গিয়ে দাঁড়াল। বীথিন সোফা থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে উত্তর দিল, 'এখনও ঘুমোইনি। দাঁড়াও আসছি।

দরজা খুলে দিয়ে বীথিন ডাকল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

যতীন ভেতরে গেলনা। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'না-না ভেতরে যাবো না। তোকে একটা কথা বলতে এলাম। আমি গাড়ির মধ্যে ততটা বুঝতে পারেনি। কিন্তু এখন ভেবে দেখলাম, তোর গাড়ির ওয়াইপার দুটো ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তুই গাড়ি নিয়ে বেরোস না। সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভাল। বর্ষা-বাদলার দিন কখন কি ঘটে যায় কে বলতে পারে।'

বীথিন নিঃশব্দে বড়দার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার কোন কিছু বলার ছিলনা। কথা শেষ করে বড়দা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাওয়া পর্যন্ত বীথিন দরজায় দাঁড়িয়ে রইল। দরজা বন্ধ করে দিতেই খাটের কোনা থেকে জয়ন্তী অসহিষ্ণু গলায় বলে উঠল, 'বড়দার আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায়।'

বীথিন জয়ন্তীকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'বড়দা বরাবরই একটু বাতিক গ্রস্থ। তাছাড়া এখন বয়েসটাও বাড়ছে তো ফলে বাতিকগুলোও বাড়ছে। নিজে শোবার আগে প্রত্যেক ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কিছু না কিছু উপদেশ দিয়ে যাবেই। এটা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।'

জয়ন্তী বলল, 'বড়দার যেমন বাড়াবাড়ি আছে। তেমনি বড়দাকে নিয়ে তোমাদেরও বাড়াবাড়ি আছে।'

খাটের দিকে পেছন ফিরে দক্ষিণের খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল বীথিন। বাইরে বৃষ্টিঝরা অন্ধকার রাত। সেই অন্ধকারের দিকে চোখ রেখেই বীথিন যেন স্বগতোক্তির মতো বলতে লাগল, 'বাড়াবড়ি হয়তো আছে, কিন্তু তার একটা মানেও তো আছে জয়ন্তী। সে মানেটা আমরা ছাড়া এ বিশ্ব সংসারে আর কেউ বুঝবে না, কারও বোঝাবার কথাও নয়। ছেলেবেলায় বাবার সান্নিধ্য পেয়েছিলাম মাত্র ক'টা বছর। সে সব স্মৃতি তো কবেই বিবর্ণ হয়ে গেছে। তারপর থেকে এই বড়দাই তো সব। লেখাপড়া শেখানো, নিজের পায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া, সব কিছুই তো বড়দাই করল। আমাদের কউকে একদিনের জন্যও বড়দা বাবার অভাব বুঝতে দেয়নি। আমি যখন রাত জেগে ডাক্তারী পড়া তৈরি করতাম তখন বড়দাও আমার সঙ্গে সঙ্গে সারারাত জেগে থাকতো। কখনও চা করে দিত, কখনও সরবৎ বানিয়ে আনতো, আরও কত কি! যেবার আমি পাশ করলাম, বড়দাই খবরটা নিয়ে এল প্রথমে। আর আশ্চর্য কি জানো, এই ছিদাম মুদী লেনের প্রত্যেকটা লোক সেদিন জানলো আমার বড়দা আনন্দে শিশুর মতো দৌড়তেও পারে। গোটা বাড়িতে লাফালাফি করে সে যা কাণ্ড করল—

কথা বলতে বলতে বীথিন ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখল, জয়ন্তী ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। মশারীর ভেতর থেকে ওর খোলা পিঠটা দেখা যাচ্ছে। বীথিন আহত বিস্ময়ে খাটের দিকে তাকিয়ে রইল।

॥ ৪ ॥

উত্তেজনায় যতীন উঠে দাঁড়াল। তার সর্বাঙ্গ কাঁপছে। লতিফ মাথা নিচু করে সামনে দাঁড়িয়ে। সে ভাবতে পারেনি বড়বাবু এতটা রেগে যাবেন। অথচ সত্যি কথাটা না বলেও উপায় নেই। বড়বাবু সামনে মিথ্যে বললে পাপ হবে। যতীন লফিতের দিকে কড়া চোখে তাকাল। তার গলা গমগম করছে, 'তুমি ভাল ভাবে খোঁজ নিয়েছে ?'

লফিত নীচু গলায় বলল, 'আমার খবরে কোন ভুল নেই। গোবিন্দ নিজে বলেছে আমাকে।'

যতীন আস্তে আস্তে নিজের চেয়ারে বসল। বলল, 'যে মেয়েটার কাছে যায় তার নাম কি ? নাম জানো ?'

লফিত বলল, 'গোবিন্দ বলেছে তার নাম বকুল।'

যতীন গম্ভীর মুখে বসে রইল। লফিত তখনও দাঁড়িয়ে। হঠাৎ খেয়াল হতেই যতীন বলল, 'ঠিক আছে, তুমি কাজে যাও। গোবিন্দ কাজে এলে আমার সঙ্গে দেখা না করে যেন না যায়। গাধাটাকে আচ্ছা করে বোঝাতে হবে। আমি এখন একটু বেরুব।'

লতিফ মাথা নেড়ে ভেতরে চলে গেল যতীনের ভেতরটা ঘৃণায় থিক থিক করছিল। তার জয়দেব মাইতিকে মনে পড়ল। গোবিন্দর বৌকে যতীন কখনও দেখেনি। কিন্তু তার মনে হল একটা দুঃখী মেয়ের মুখ সে যেন দেখতে পাচ্ছে। মেয়েরা তো চিরকালের অসহায়। গোবিন্দরা লম্পট হলেও সেই লম্পট স্বামীর জন্যে বৌটা প্রতি মাসে পথ চেয়ে থাকে। কোলের বাচ্চাটা হয়তো বাবার জন্যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে। যতীন ভেবে পায়না, মানুষ কেন ভালবাসা পেয়ে তাকে হারাতে চায়, কেন অকারণে একজনের পাপ সারা জীবন অন্যকে বইতে হয়। গোবিন্দর ওপর যতীনের রাগটা

বেড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু সে জানে গোবিন্দর মতো বোকা বজ্জাতদের ওপর রেগে গিয়ে লাভ নেই। ওদের মনের মধ্যে কোথায় পচন ধরেছে, সে জায়গাটা খুঁজে পাওয়া দরকার। হয়তো সঙ্গ দোষে ওকে যেতে হয়। যতীনের মনে হল আজই গোবিন্দকে ডেকে ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার ভাল করে বোঝাতে পারলে নিশ্চয়ই গোবিন্দর সুমতি হবে।

হাতের কাজ শেষ করে যতীন উঠে পড়ল। এখনই একবার কলেজ স্ট্রীট যাওয়া দরকার। অসীমবাবু লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছেন। হয়তো কোন জরুরী কাজ। অতএব, যতীন উঠে পড়ল। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ করছে দুপুর। একটা বিকল ট্রাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকায় গোটা রাস্তাটায় গাড়ি আর মানুষে জট পাকিয়ে গেছে। যতীন হাঁটতে হাঁটতে খানিকটা এগিয়ে এল। এখান থেকে বাসে উঠতে পারলে কলেজ স্ট্রীটে যাওয়া সহজ হবে। প্রথম বাসটা ছেড়ে দিল যতীন। পাদানিতে ঝুলে যাওয়ার অভ্যেস এখন আর যতীনের নেই। পরের বাসটাতে উঠে পড়ল।

বইপাড়া এখন নেতিয়ে থাকে। রোদ্দুরের তাপে দোকানের সামনে খসখসি ঝুলিয়ে রেখেছে অনেকে। যতীন কপালের ঘাম মুছতে মুছতে অসীম হালদারের ঘরে এল। অসীম হালদার চেয়ারে বসে হিসেব দেখছিল। যতীনকে দেখেই দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আরে আসুন, আসুন ঘোষবাবু।'

যতীন ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'এত জরুরী তলব কেন?' ঘটনাটা কি?'

অসীম হালদার হিসেবের খাতা বন্ধ করে দিয়ে বলল, 'বড্ড ঝামেলায় পড়ে গেছি। বাজারের অবস্থা তো দেখছেন। নাটক-নভেল বেচে পেটের অন্ন জোটেনা। ভরসা তো ওই কয়েকটা ল'য়ের বই। সেই বই নিয়েই ফেঁসে গেছি। এখন বিপদটা আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।'

যতীন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হাসতে হাসতে বলল, 'কিন্তু বিপদটা কী?

অসীম হালদার সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'তার আগে আপনার জন্যে কোল্ড কফি আনাই।'

যতীন বলল, 'তা আনান, কিন্তু কাজের কথাটা বলুন।'

অসীম হালদার বলল, 'পঞ্চাশ ফর্মার বইয়ের গোটা কাজটা যে প্রেসে দিয়েছিলাম সেখানে কাল থেকে হঠাৎ লেবার ট্রাবল আরম্ভ হয়েছে। যে কোনদিন প্রেস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই আমি কপি তুলে নিয়েছি। এবার ওই কাজটা আপনাকে তুলে দিতে হবে।'

যতীন চশমাটা খুলতে খুলতে বলল, 'সময় কতদিন দেবেন?'

অসীম হালদার কাতর গলায় বলে উঠল, 'মেরে-কেটে তিরিশদিন সময় তার মধ্যে বই বাজারে বার করতে হবে।'

যতীন এবার হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'এবার আপনি হিসেব করে বলুন না কাজটা করা যায় কিনা।'

অসীম হালদার যতীনের হাতটা চেপে ধরে বলল, 'যায়না বলেই তো আপনাকে ডাকা। আচ্ছা ঠিক আছে, পঞ্চাশ দরকার নেই, তিরিশ ফর্মা করে দিন।'

যতীন কিছু বলতে যাবার আগেই দরজার খসখসি সরিয়ে কাউন্টারের সামনে তিনটে মেয়ে এসে দাঁড়াল ওদের হাতের বই-খাতা দেখে যতীন বুঝল হয়তো কাছাকাছি কোন কলেজের মেয়ে। কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে বলে উঠল, 'কি হল, আমাদের বই এসেছে?'

যতীন বুঝল মেয়েগুলো অসীম হালদারের বাঁধা খদ্দের। অসীম হালদার বলল, 'আমাকে দেখলেই বুঝি বইয়ের কথা মনে পড়ে। যেগুলো কেনা হয়েছে সেগুলো শেষ করো। এটা আসছে হপ্তায় পাবে।'

তিনটি মেয়ের মুখেই অসহিষ্ণু ভাব ফুটলো। যে মেয়েটি কথা বলছিল সে এবার কাউন্টারে রাখা টেলিফোনটার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'আপনার ফোনটা ঠিক আছে।'

অসীম হালদার মাথা নাচিয়ে বলল, 'এখানে চড়াও হওয়ার আসল কারণ তাহলে টেলিফোন। তা সেটাই প্রথমে বললে হতো।'

মেয়েটি এক পা এগিয়ে এসে খুব অভ্যস্ত ভঙ্গিতে ফোনের নম্বর ঘোরাতে লাগল। যতীন মুখ ঘুরিয়ে মেয়েগুলোকে একবার দেখেছিল। এখন আবার কাজের কথায় ফিরে আসতে চাইছিল। কিন্তু কাজের কথা আরম্ভ করতে গিয়ে যতীন থেমে গেল। মেয়েটি রিসিভার কানে লাগিয়ে বলছে, 'হ্যালো, ইউবি আই, দীপঙ্কর ঘোষকে একটু দিন না।'

যতীন উৎকর্ণ হয়ে রইল। মেয়েটি ফোন ধরে অপেক্ষা করছে। সম্ভবত ওপাশ থেকে সাড়া পেয়ে মেয়েটি বলে উঠল, 'কে দীপু! আমি ঝুমা বলছি। দুদিন ধরে পাত্তা নেই কেন?'

যতীন আস্তে আস্তে ঘাড়টা ঘোরাল। মেয়েটি এখন অন্য দিকে তাকিয়ে। ফলে সে বুঝতে পারল না, কেউ তাকে গোপনে লক্ষ্য করছে কিনা। যতীন মেয়েটিকে দেখতে লাগল। ঝুমা টেলিফোনে ওপাশের কথা শুনে নিয়েবলল, 'থাক থাক, আর বানিয়ে মিথ্যে বলতে হবেনা। তোমার মেজবৌদি বড়দাকে বলেছেন? কি বললে? ওহরি? এখনও বড়দাকে বলাই হয়নি। দূর ছাই, তুমি খালি দেরি করিয়ে দিচ্ছ। কী বলছো? ভালো করে বল, শুনতে পাচ্ছিনা। তার মানে তোমাদের কারো দ্বারাই কিচ্ছু হবেনা। তার চেয়ে আমি নিজেই বড়দাকে গিয়ে বলব। কী বলছো? বড়দা ফুটিয়ে দেবে? দেখবো কেমন ফোটায়! মুশকিল হচ্ছে তোমার বড়দা তো ব্যাচেলর, এই প্রোবলেমটা ঠিক বুঝবে না। প্লিজ তুমি মেজবৌদিকে বল, বড়দাকে যেন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ম্যানেজ করে ফেলেন। আচ্ছা, আচ্ছা, এখন ছেড়ে দিচ্ছি। কাল সোয়া ছ'টার মধ্যে আসবে কিন্তু—!

ফোন রেখে ওরা চলে যেতেই যতীন ঘুরে বসে অসীম হালদারের মুখোমুখি হল। খুব সহজ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়েটিকে চেনেন?'

অসীম হালদার ফাইল থেকে কপি বার করতে করতে বলল, 'মেয়ে তো তিনটে, আপনি কোনটির কথা বলছেন?'

যতীন একই ভাবে বলল, 'যে টেলিফোন করছিল!'

অসীম হালদার কাজ করতে করতে বলল, 'বেশ ভালোই চিনি।

ওর নাম ঝুমা। বেথুনে পড়ে। ওর বাপ হচ্ছে মস্ত বড়লোক। জাতিতে সোনার বেনে। কলকাতায় খান কয়েক বাড়ি আছে, ট্র্যানসপোর্টের বিজনেস আছে, তাছাড়া জাত ব্যবসা তো আছেই। লক্ষ্মী তো মশাই ওদের ঘরেই বাঁধা।'

যতীন শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'হুঁ।'

প্রেসে ফিরে এসে যতীন গোবিন্দব খোঁজ করল। ম্যানেজারবাবু ভেতর থেকে এসে জানাল গোবিন্দ আজও এসে হঠাৎ চলে গেছে। লতিফকে নাকি শাসিয়ে গেছে সে যেন বড়বাবুর কাছে মুখ না খোলে। ম্যানেজার পরেশবাবুকে বলেছে তার শরীব ভালো নেই। ডাক্তার দেখাতে যাচ্ছে। ভাল থাকলে কাল আসবে।

পরেশবাবুর মুখ থেকে কথাগুলো শুনতে শুনতে যতীনের চোয়াল শক্ত হয়ে এল। এতটা সে ভাবতে পারেনি। এবার একটা জিনিস যতীনের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, গোবিন্দ জেনে শুনেই তাকে এড়িয়ে যাচ্ছে। যতীন মনে মনে বিশ্বাস করে তার প্রেসের সবাই তার অত্মীয়-বান্ধব। অতএব, দীপু যেমন আজও তার বড়দার মুখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলতে পারে না গোবিন্দও বুঝি পারবে না। আর সেই কারণেই সে বড়বাবুর মুখোমুখি হতে চাইছে না। যতীন গোবিন্দর ওপর রেগে যেতে যেতেও ভাবল, গোবিন্দটা নিতান্ত বোকা বলেই সর্বনাশের পাঁকে মুখ লুকিয়ে নিজেকে আড়াল করতে চাইছে। ওর এই কাজের পরিণাম ভোগ করবে ওরই বৌ আর মেয়ে। যতীন ভেতরে ভেতবে চঞ্চল হল। তার মনে হল, দীপুও তো গোবিন্দর বয়সী। হয়তো দু'চার বছরের ছোট হলেও হতে পারে। অথচ এই ছেলেটা তারই চোখের সামনে নষ্ট হয়ে যাবে এটা ভাবা যায় না, এমনটা হতে দেওয়াও উচিত নয়। সে তো জয়দেব মাইতিকে কথা দিয়েছে, ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনবে।

যতীনের মধ্যে একটা কর্তব্যবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তার মনে হল, আজই সন্ধ্যের পর গোবিন্দর মেসে যাওয়া দরকার। ছেলেটাকে না ফেরাতে পারলে যতীনের মুখ থাকবে না। তার প্রেসের লোক মানে তো তারই লোক, সেই লোক যদি আস্তে আস্তে

খারাপ হয়ে যায় তাহলে যতীনের কিছু দায় থেকে যাবে। যতীনের ভেতরে একটা অস্বস্তি হচ্ছিল। সে কাজের মধ্যে মনটাকে ডুবিয়ে দিতে দিতে ভাবল, আজই ওর মেসে যাওয়া দরকার।

রাজাবাজারের কাছাকাছি গোবিন্দর মেস। যতীন অনেকদিন আগে একবার এসেছিল। যত সহজে খুঁজে পাবে ভেবেছিল, তত সহজে পেলনা। প্রেস থেকে বেরিয়ে খানিকটা ঝোঁকের মাথাতেই চলে এসেছে। প্রেসের কাউকে সঙ্গে আনলে খুঁজে পাওয়াটা সহজ হতো। কিন্তু কোন কিছুতেই হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয় যতীন। তার মধ্যে একটা জেদ চেপে গেছে। খানিকটা খোঁজাখুজি করতেই মেসটার হদিশ পাওয়া গেল। গোবিন্দ মুখে মেস বললেও এটা আক্ষরিক অর্থে ঠিক মেসবাড়ি নয়। একটা বাড়ির নিচের তিনখানা ঘরে জনা ছয়-সাত লোক থাকে। গোবিন্দও তাদের একজন। বাড়ির বারান্দায় ডোরাকাটা লুঙ্গি পরে একজন মাঝ বয়েসী লোক দাঁড়িয়েছিল। যতীন এগিয়ে গিয়ে তাকেই জিজ্ঞেস করল, 'গোবিন্দ মাইতির ঘর কোনটা?'

লোকটা যতীন কে একবার আপাদমস্তক চোখ দিয়ে মেপে নিয়ে বারান্দার কোনের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, 'ওই শেষের দরজাটা। ঘরে পাবেন বলে মনে হয়না।'

ঘরে আলো জ্বলছিল। দরজা ভেতব থেকে ভেজানো, সেই দরজার ফাঁক দিয়ে একফালি আলো বারান্দায় এসে পড়েছে। যতীন দরজা ঠেলতে গিয়ে থেমে গেল। বাইরে থেকে ডাকল, 'গোবিন্দ! গোবিন্দ আছিস?'

ঘরের ভেতর থেকে উত্তর এল না, কিন্তু দরজার পাল্লা খুলে সামনে দাঁড়াল গোবিন্দরই বয়েসী একটি ছোকরা। তারও পরণে নীল লুঙ্গি, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। যতীনকে দেখে ছেলেটা একটু অবাক চোখে তাকাল। যতীন ছেলেটার কাছেই জানতে চাইল, 'গোবিন্দ আছে?'

ছেলেটা বলল, 'গোবিন্দ নেই। এ সময় ওকে এখানে পাওয়া যায় না।'

যতীন ছেলেটাকে ভাল ভাবে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বলল,

'আপনি কি ওর সঙ্গে এই একই ঘরে থাকেন ?'

ছেলেটা ঘাড় নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ।'

যতীনের মনে হল গোবিন্দর কিছু খবর এই ছেলেটার কাছ থেকে পাওয়া যেতে পারে। ছেলেটার সঙ্গে কথা বলবার জন্যেই যতীন বলল, 'আমার নাম যতীন্দ্রনাথ ঘোষ। গোবিন্দ আমার প্রেসেই চাকরী করে। ক'দিন থেকে কামাই করছে, শুনলাম ওর নাকি অসুখ, তাই দেখতে এসেছিলাম। আপনার নামটা জানতে পারি কি ?'

ছেলেটা দরজার সামনে থেকে সরে গিয়ে বলল, 'আসুন, ভেতরে আসুন। আমাব নাম নিমাই ঘোষ। আমিও ওর দেশের লোক ও থাকে রামনগর আমি অলঙ্কারপুর। দীঘার কাছাকাছি গ্রাম আর কি !'

যতীন ঘরে ঢুকে দেখল পাশাপাশি দুটো তক্তাপোষ। একটায় বিছানা গোটানো অন্যটা পরিপাটি করে পাতা। সেই পাতা বিছনার ওপর বই-খাতা ছড়ানো। পড়াশোনা করতে করতে উঠে গেলে বই-খাতা যেমন থাকে তেমনই চেহারা। নিমাই বইপত্র সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আপনি বসুন।'

যতীন সরিয়ে রাখা বই-পত্রেব দিকে দেখতে দেখতে বলল, 'আপনি বুঝি পডাশোনা করেন ?'

নিমাই যেন লজ্জা পেল। একটা বইয়ের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বলল, 'না, মানে কৃষক পরিবারের ছেলে। ছোট বেলায় পড়াশোনাটা হয়নি। বাবা ভেবেছিলেন চাষ-বাস শিখলেই পেট চলে যাবে। তা পেট চলছে না বলেই কলকাতায় একটা অফিসে বেয়ারার চাকরী করি আর রাত্রে পড়াশোনা করছি যদি প্রাইভেট পরীক্ষা দিতে পারি সেই আশায়।'

যতীন যেন মুগ্ধ হয়ে গেল। তার মনে হল এই ছেলেটার চোখে মানুষ হওয়ার স্বপ্ন জ্বলছে। অথচ গোটা রাত একটা অমানুষ ওর ঘরে, পাশের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঘুমোয়। যতীন মুগ্ধ চোখে নিমাই-য়ের দিকে তাকাল। বলল, 'আপনাকে দেখে আপনার ওপর শ্রদ্ধা হচ্ছে। অথচ দেখুন, গোবিন্দটা দিন-দিন কেমন বিগড়ে

যাচ্ছে। ওর বাবা অভিযোগ করে গেছে ও নাকি বাড়িতে টাকা দেয়না, চিঠিপত্র দিয়ে খোঁজও নেয় না।'

নিমাই মুখ তুলে তাকাল যতীনের দিকে। ওর মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিমাই বলল, 'টাকা আর পাঠাবে কোত্থেকে! যা মাইনে পায় তাতো বে-পাড়ায় গিয়ে খরচ করে আসে। বাজারেও বিস্তর দেনা। দু'টাকা পাঁচ টাকা করে আমার কাছ থেকেও প্রায় একশ টাকা দেনা করছে।'

যতীন ক্রুদ্ধ চোখে গোবিন্দর বিছানাটার দিকে দেখিয়ে বলল, 'ও রাতে ফেরে কখন?'

নিমাই ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, 'কোন ঠিক নেই। এ বাড়ির সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়ে। আমি জেগে থেকে পড়াশোনা করি বলে জানি, ও কখন ফেরে। প্রথম প্রথম বলত ওভারটাইম ছিল। পরে একদিন চাপাচাপি করতেই সব স্বীকার করেছে।'

যতীন থমথমে গলায় বলল, 'আমি এসব খবর শুনেছি। ওপাড়াব বকুল বলে একটা মেয়ের কাছে গোবিন্দ যায়। আমি ছেলেটাকে ফেরাতে চাই। ওর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়া দরকার।'

নিমাইকে চিন্তিত দেখাল। বলল, 'দেখা হওয়া মুশকিল। আজও গোবিন্দ বকুলের কাছেই গেছে। কত রাতে ফিরবে তার কোন ঠিক নেই।'

যতীনের মধ্যে জেদটা প্রবল হয়ে উঠছিল। সে সেই জেদের গলাতেই বলল, 'দরকার হলে আমি ওই বকুলের কাছেই যাব। গোবিন্দকে এখনই আমার দরকার। ওর বাবাকে আমি কথা দিয়েছি।'

নিমাই ঠাণ্ডা চোখে যতীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওখানে গিয়ে রাতের বেলা আপনি বকুলের ঘর খুঁজে পাবেন? যেতে পারবেন ওপাড়ায়?

ভেতরে জেদ থাকলেও যতীন মনে মনে গুটিয়ে এল। সত্যিই এব্যাপারটা সে তলিয়ে দেখেনি। ওপাড়া ঠিক কোথায় কেমন করে যেতে হয়, পাড়ার কোন ঘরে বকুল থাকে সে সব যতীন

ভাবে নি। ভাবতে গিয়ে সমস্যাটা তার কাছে অনেক বড় মনে হল। অসহায় চোখে যতীন নিমাইয়ের দিকে তাকাল। নিমাই জানত এরকমই হবে। নখ খুঁটতে খুঁটতে নিমাই বলল, 'আপনি কি আজই দেখা করতে চান?'

যতীন বলে উঠল গোবিন্দ তো পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। তাই আমি চাই ওকে হাতে-নাতে ধরতে। যাতে কোন মিথ্যে বলবার সুযোগ ও না পায়।

নিমাই উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে একটা দড়ি টানানো ছিল। সেই দড়ির ওপর নিমাইয়ের প্যাণ্ট শারট আর একটা পাজামা ঝুলছিল। সেই দড়ি থেকে প্যাণ্ট টেনে নিয়ে নিমাই পরতে পরতে বলল, 'চলুন, আমি নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে। দেখুন চেষ্টা করে যদি ছেলেটাকে ফেরাতে পারেন।'

যতীন যতটা খুশি হল ততটাই অবাক। তার গলায় আনন্দ আর বিস্ময় মিশে গেল। বলল, 'আপনি চেনেন?'

গায়ে জামা চাপাতে চাপাতে নিমাই উত্তর দিল 'গোবিন্দ একদিন জোর করে আমায় নিয়ে গিয়েছিল। প্রথমে জানতাম না কোথায় যাচ্ছি। পরে বুঝে ছিলাম। আমি চলে এসেছিলাম, গোবিন্দ সেদিন গোটা রাতটাই থেকে গিয়েছিল।'

যতীন মনে মনে নিমাইয়ের ওপর কৃতজ্ঞ হল। নরম গলায় বলল, 'আমি এসে আপনাকে অযথা কষ্ট দিলাম। পড়াশোনারও ক্ষতি হল। আসলে চোখের সামনে একটা ছেলে গোল্লায় যাবে এটা ভাবতেই মনে হল কিছু একটা করা দরকার।'

নিমাই দরজায় তালা দিতে দিতে বলল, 'আমি বলে বলে পারিনি থেমে গেছি। যদি আপনি পারেন সেই আশাতেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি। গোবিন্দ অমানুষ হতে পারে কিন্তু সাবিত্রী তো ওকেই ভালবাসে।,

যতীন চট্ করে মুখ ঘোরাল। 'সাবিত্রী কে?,

নিমাই চাবিটা প্যাণ্টের পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'গোবিন্দর বৌ। আমাদেরই পাড়ার মেয়ে। জমিজমা আছে দেখে গোবিন্দর

সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়েছিল।'

যতীন বারান্দার অন্ধকারে নিমাইয়ের মুখটা দেখতে পেলনা। নিমাই বারান্দা পেরিয়ে যাচ্ছে। যতীনের মনে হল, নিমাইয়ের গলার স্বরে একটা আর্দ্র বিষণ্নতা, যেন শ্রাবণের ভেজা আকাশ তার গলায় নেমে এসেছে।

রথীন খাটের ওপর বুকে পালিশ চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে ছিল। অফিস থেকে ফিরে কোন সাপ্তাহিক কিংবা বই-টই হাতের কাছে পেলে এরকম উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে রথীন পড়ে। ঘরের এক কোনে রাখা ওয়াড্রব খুলে উমা রথীনের অফিসের প্যাণ্ট-জামা সাজিয়ে রাখছিল। এক পোশাক দু'দিনের বেশি পরে না রথীন। নতুন জামা-প্যাণ্ট আগের দিনেই সাজিয়ে রাখে উমা। দরজার বাইরে থেকে বীথিন ডাকল, 'ছোড়দা আছিস নাকি?'

রথীন উঠে বসতে বসতে বলল, 'আয়'।

বীথিন ঘরে এল। বাড়ি এসেই বীথিন পাজামা আর আদ্দির পাঞ্জাবী পরে। রথীনের খাটের ওপর বসতে বসতে বলল, 'ঘুমোচ্ছিলি নাকি?'

রথীন বালিশটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলল, 'না এমনই শুয়ে পড়ছিলাম। তুই আজ সকাল সকাল ফিরলি যে?

বীথিন ছোড়দার প্যাকেট থেকে সিগারেট নিয়ে বলল, 'শরীরটা ভালো নেই বলে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। ভাবছি ক'দিন রেস্ট নেব।'

রথীনও সিগারেট ধরিয়ে নিল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'দিন কয়েক বাইরে থেকে ঘুরে আয়। শরীরটা ফ্রেশ লাগবে। বড়দাকে তো কত বলি, কিছুতেই গা করে না। এবার পুজোর সময় বড়দাকে জোর করে নিয়ে যাব।'

বীথিন সিগারেটের আগুনটার দিকে চোখ রেখে চাপা ক্ষোভের সঙ্গে বলল, 'বড়দা দিন-দিন বড্ড একগুয়ে হয়ে উঠছে। আমার ওই নার্সিং হোম করার ব্যাপারে বড়দা এরকম একটা অ্যাটিচুট নেবে

ভাবতেই পারিনি। আমার পজিশানটা এবার বোঝ। বড়দাকে রাজী করাতে পারছিনা আবার শ্বশুরমশাইকেও রিফিউজ করতে পারছিনা। কারণ ওঁর অফারটা রিফিউজ করলেই উনি ইনসালটেড ফিল করবেন।'

সিগারেট টানতে টানতে রথীন বলল, 'কিন্তু বড়দা রাজি না হলে তোর পক্ষে মুভ করাও মুশকিল। আফটার অল বড়দা এখনও আমাদের···

রথীনকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বীথিন বলে উঠল, 'সেটাই তো হয়েছে মুশকিল।'

বীথিনের গলার ক্ষোভটা এবার স্পষ্ট হল। অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা অ্যাসট্রেতে গুঁজতে গুঁজতে উমার দিকে তাকাল। ওয়াড্রবের দরজা বন্ধ করছিল উমা। রথীন ছোটভাইয়ের কণ্ঠস্বরে ক্ষোভটা ধরতে পারল। উমা চলে যাচ্ছিল। বীথিন ডাকল, 'বৌদি শোন!'

উমা ফিরে এল খাটের কাছে। বীথিন উমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সমস্যাটা তো বুঝছো। এতবড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেলে জীবনে আর কোনদিন সুযোগ পাব না। তুমি বড়দাকে রাজী করাতে পারবে?'

উমা খাটের কাছে সরে এসেছিল। এবার দেওরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি তো দীপুর ব্যাপারটাই সাহস করে বলতে পারছি না। এদিকে দীপুতো তাগাদা দিয়ে দিয়ে আমায় জ্বালিয়ে খেল।'

রথীন কোলের ওপর রাখা বালিশে কনুয়ের চাপ দিয়ে ভাল করে গুছিয়ে বসে বলল, 'তোর ব্যাপারটা উমার সাবজেকট নয়। দেখি আমি একবার ট্রাই করে বড়দাকে রাজী করাতে পারি কি না।'

বীথিন বলল 'তাহলে তুই-ই দেখ। ব্যাপারটাতে কোথায় যে আপত্তি সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

রথীন সিগারেটে শেষ টান দিয়ে বলল, আপত্তি বোধহয় শ্বশুর-মশাই-এর টাকাতে।'

বীথিন তর্ক করার ভঙ্গিতে বলল, 'এই আপত্তির কোন লজিক

খুঁজে পাচ্ছি না।'

রথীন জানে, বড়দার সব কথার যুক্তি খুঁজতে যাওয়ার কোন্‌ মানে হয়না। বড়দার নিজের মনের মধ্যে একটা ছক তৈরি করা আছে। সেই ছকের মধ্যে ভাইদের বড় করে তুলেছে। সংসারের সব কটা মানুষকে সেই ছকের মধ্যেই বরাবর রাখতে চায় বড়দা। কেউ তার বাইরে গেলে বা যেতে চাইলে বড়দা মনে মনে কষ্ট পায়।

নিজের কতকগুলো ধারণা আছে, হয়তো সব মানুষেরই থাকে কিন্তু বড়দার ধারণাগুলো অনেকটা এসেছে বড়দার নিজস্ব বিশ্বাস আর অতি ভালবাসা থেকে। তার ধারণা দীপু এখনও নাবালক, রথীন কিংবা বীথিন গায়ে গতরে বাড়লেও ওরা আসলে সেই তিনসুকিয়ায় রথী আর বীথি। খাবার টেবিলে বসে বড়দা এখনও ভাইদের খাওয়ার তদারকি করে। রাত্রে শোবার আগে ওপরে এসে সবার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পরামর্শ দেয়। বড়দা যেন এখনও অনেক পেছনের দিনগুলোতে দাঁড়িয়ে। তার চারপাশের সময় যে কত দ্রুত বদলে গেছে, মানুষের মন যে দিন-রাত কেমন করে বদলাচ্ছে সে খবর বোধহয় বড়দা জানে না। তার বুক জোড়া সেই অটল বিশ্বাস আর ভালবাসা—যাকে বীথিন কিংবা অন্যরা কোন যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারবে না। অথচ বড়দা নিজেও টের পায়না তার সেই পুরনো বিশ্বাস আর ভালবাসা বিশ বছর আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ এই বিশ বছরে পৃথিবীটা কতখানি বদলে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে একদম বদলাতে পারেনি বড়দা। এখনও তাঁতের ধুতির সঙ্গে খদ্দরের পাঞ্জাবী ছাড়া বড়দা আর অন্য কোন পোশাক পরেনা। রঙও সেই একটা—সাদা। সাদা ছাড়া অন্য কোন রঙ বড়দাকে কেউ কখনও পরতে দেখেনি। দীপু চাকরী পেয়ে বড়দার জন্যে একবার টেরিকটের কাপড় কিনে এনেছিল পাঞ্জাবী বানাবে বলে। গোলাপী রঙের সেই কাপড় শেষ পর্যন্ত ফেরৎ দিতে হয়েছিল দীপুকে। সাদা ছাড়া অন্য কোন রঙ তার পছন্দ নয়।

বীথিন উঠে দাঁড়িয়েছিল। এবার যেতে গিয়ে ডাকল, 'ছোড়দা।' রথীন চমকাল। বড়দার কথা ভাবতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল

রথীন। বীথিন বলল, 'তুই তাহলে দায়িত্ব নিলি। আমি আর নিজে কিছু বলছি না।'

রথীনের মধ্যে খানিক আগের সেই অন্যমনস্কতা থেকে গিয়েছিল। সে শুধু বলল, 'দেখি চেষ্টা করে।'

বীথিন চলে যাচ্ছিল। রথীন পেছন থেকে ডেকে বলল, 'বীথি, আমার প্রেসারটা একটু চেক করে দিবি ?'

বীথিন দরজার গোড়া থেকে উত্তর দিল, 'ঘরে আয় চেক করে দিচ্ছি।'

রথীন খাট থেকে নামল। উমা খাটের কাছ থেকে সরে যেতে যেতে বলল, 'তোমাকেও বাতিকে পেয়েছে। ঠাকুরপোকে দেখলেই প্রেসার মাপাতে চাও।'

রথীন উমাকে বোঝানোর ভঙ্গি করে বলল, 'বাতিক নয় আমার অফিসে আমারই বয়েসী দু'জনের অ্যাটাক হয়েছে।'

উমা ঠোঁট বেঁকিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করল। সে জানে মাসে দু'বার তিনবার করে প্রেসার চেক করানোটা বাতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। একটু কমলে সারারাত খালি কানের কাছে বলবে, কমল কেন বলত ? আর যদি বাড়ে তাহলে তো কথাই নেই। উমা চলে যাচ্ছিল। এখন নিচে তার অনেক কাজ। রথীন উমাকে আটকালো। বলল, 'বড়দা রাজী হচ্ছেনা কেন বলত ?'

উমা চোখ তুলে স্বামীকে দেখল। তারপর চোখ নামাতে নামাতে বলল, 'সে কথা আমি কেমন করে বলব'।

রথীন চোখ নাচিয়ে বলল, 'পাশ কাটিয়ে গেলে চলবে না। তুমি ঠিকই জান বড়দা কেন আপত্তি করছে।'

উমা নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তুমিও তো জান।'

রথীন ছোট্ট করে মাথাটা দোলাল। বলল, 'জানি বলা ভুল। বরং বলা যায় অনুমান করতে পারি। বড়দা চান না তার আদরের ছোট ভাই বড়লোক শ্বশুরের অনুগ্রহে দাঁড়াক কিংবা শ্বশুরের ন্যাওটা হয়ে থাক।'

উমা চলে যেতে যেতে বলল, নুনের বাঁধ দিয়ে সাগরের জল আটকানো যায় না।'

॥ ৫ ॥

নিমাইয়ের সঙ্গে সেনট্রাল অ্যাভিন্যুতে একটা পেট্রল পাম্পের কাছে যতীন নামল। তারপর নিমাইয়ের পিছু পিছু যত ভেতরে ঢুকতে লাগল কলকাতা তার কাছে ততই অচেনা মনে হতে লাগল ভয় বা ঘৃণা করবার মতো কোন ব্যাপার চোখে পড়ল না, তবুও তার ক্রমাগত মনে হতে লাগল যেন ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটছে। পানের দোকান। বেলফুলের মালা বিক্রেতা, গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কুলপি মালাই সবাইকে তার অচেনা দেশের মানুষ বলে মনে হচ্ছিল। গলির মধ্যে ছড়ানো ছেটানো ভিড়। সেই ভিড়ের মধ্যে ট্যাকসী ঢুকছে, রিকশা যাচ্ছে, দেদার মানুষ মাছির মতো ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে কেউ কাউকে লক্ষ্যই করছেনা। চলমান রিকশা থেকে একটা লোক পিচ্ করে পানের পিক ফেলল। যতীনের সাদা পাঞ্জাবী ছুঁয়ে গেল সেই পিকটা। যতীন দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের পাঞ্জাবীর দিকে তাকাল। লোকটা যতীনকে গ্রাহ্যই করল না। যতীন লোকটার আবিবেচনায় কিছু বলতে যাচ্ছিল, নিমাই এসে হাত চেপে ধরে চাপা গলায় বলল, কিছু বলার দরকার নেই, চলে আসুন। এখানে দাঁড়াবেন না।'

যতীন অবুঝ গলায় নিমাইকে প্রায় ধমক দিয়ে বলে উঠল, লোকটার কোন সিভিক সেনস নেই। রাস্তায় এত লোক তার মধ্যে কেউ এভাবে পানের পিক ফেলে!'

নিমাই যতীনের হাতে চাপ দিয়ে গলা খাটো করে বলল, এখানে অধিকাংশ লোকই এখন মত্তপ। কারো সেনস নেই।'

যতীন কথা বলবার আগেই গুড্যা মতন একটা লোক যতীনের কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বসবেন নাকি? ভাল জিনিস আছে।'

যতীন লোকটার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাবার আগেই লোকটা একটা রিকশার দিকে ছুটে গিয়ে একজন প্রৌঢ় চীনাকে পাকড়ে ফেলল। চারপাশে চোখ্ বুলিয়ে যতীনের মনে হল সে যেন কোন আন্তর্জাতিক

ট্রেড স্কেয়ারে এসে গেছে। নানা জাতের লোক আসছে আর এদি ও-দিকের গলি-ঘুপচিতে ঢুকে যাচ্ছে। গোবিন্দ কি এরকম জায়গা রোজ আসে? ত্ব'পাশের ঘরগুলো থেকে নানা শব্দ আসছিল কোথাও হারমোনিয়মের আওয়াজ, কোথাও ঘুঙুর, কোথাও ব রেকর্ডের গানের, সব মিলিয়ে একটা শব্দের কোলাহল। একটা সর গলিতে পর পর কয়েকটা মেয়ে দাঁড়িয়ে। যতীন মাথা নীচু করে এগুতে লাগল। নিমাই অনেকটা পথ হেঁটে এসে একট বারান্দার সামনে দাঁড়াল। মাঝখানে বাঁধানো চাতাল আর সেই চাতালকে ঘিরে চারিদিকেই দোতালা বাড়ি। কোন-কোনটা বুঝি তিনতলাও আছে। চাতালের এক পাশে শিবের মন্দির। নিমাই সামনের দরজাটা দেখিয়ে দিয়ে বলল, 'ওই সবুজ রঙের দরজাটাই বকুলের ঘর। আপনি যান, আমি যাবনা। আমায় দেখলে গোবিন্দ বুঝে যাবে আমিই আপনাকে পথ দেখিয়ে এনেছি।'

সবুজ রঙের দরজাটার দিকে তাকিয়ে যতীনের মাথার রক্ত দপ করে জ্বলে উঠল। তার গা ঘিনঘিন করছিল। এবার গোটা রাগ-টাই ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছিল গোবিন্দর ওপর। যতীন নিমাইয়ের কথায় কোন উত্তর না দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল সবুজ দরজাটার দিকে। বন্ধ দরজার কড়া নাড়ার পরিবর্তে সে দরজাটার গায়ে লাথি কষিয়ে দিল। এবং আশ্চর্য, দরজাটা ভেতর থেকে আদৌ বুঝি বন্ধ ছিল না। লাথি পড়তেই দরজাটা হাট হয়ে খুলে গেল।

যতীনের চাইতে বেশি অবাক হয়ে গেল ঘরের লোকগুলো। শুধু সায়া আর ব্রা পরে একটা নাতুস-নুতুস চেহারার মেয়ে তার কাজলটানা চোখ জোড়া তুলে দরজার দিকে তাকাল। দরজায় দাঁড়ানো যতীনের চোখ থেকে তখন আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে। ঘরের মধ্যে বসে থাকা লোকগুলো হঠাৎ এমন ঘটনার জন্য বোধহয় একেবারেই তৈরি ছিল না। ওরা ঘাবড়ে গিয়ে বোকার মতো দরজায় দাঁড়ানো যতীনের দিকে তাকিয়ে রইল। শুধু ওই দলের একজন হঠাৎ দল থেকে ছিটকে গিয়ে মেয়েটার আড়াল নিয়ে খাটের নিচে ঢুকে গেল। গোটা ঘটনাটা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেলেও দৃশ্যটা

যতীনের নজর এড়াল না। যতীন দরজায় দাঁড়িয়ে বাঘের গলায় গর্জন করল, 'গোবিন্দ। বেরিয়ে আয় গোবিন্দ।'

মেয়েটা আস্তে আস্তে খাটের কাছ থেকে দরজার দিকে এগিয়ে এল। মেয়েটার লম্বা বিনুনীতে জরির ফিতে জড়ানো। বিনুনীর গোড়ায় জুঁই ফুলের মালা। বুকের ছোট্ট জামাটায় রঙ-বেরঙের বাহারী কাঁচ বসানো। ঘরেব আলো সেই কাঁচে লেগে মেয়েটার বুক থেকে আলোর ঝিলিক ছিটকে উঠছিল। চোখে আলো লাগতেই যতীন মুখ সরিয়ে নিল। মেয়েটা নিজের শরীরটা দোলাতে দোলাতে সামনে এসে দাড়াল। যতীনের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে মেয়েটা জিভ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করল। যতীন আগুন চোখে মেয়েটার দিকে তাকিয়েছিল। মেয়েটা যতীনকে গ্রাহ্যই করল না। বেমালুম বাঁ হাতটা তুলে যতীনেব থুত্‌নী নাড়িয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'দরজায় দাঁড়িয়ে কেন নাগর, বসতে চাও তো চাঁদের হাটে এসে বসো না।'

চোখের পলকের মধ্যে ঘটনাটা ঘটে গেল। যতীন অপমানে আর লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিতে নিতে শুনল, ঘরের লোকগুলো মেয়েটার কথায় হো-হো করে হাসছে। দরজা থেকে সরে আসছিল যতীন। একটা মাতাল টলতে টলতে উঠে এসে যতীনকে খিস্তি করল। যতীনের কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে, সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণায়। অপমানের স্বাদ যে এত তীব্র এটা আগে কখনও টের পায়নি যতীন। যতীন কে চুপ করে থাকতে দেখে উঠে আসা মাতালটা যতীনকে ধাক্কা দিয়ে সরাতে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তেই যতীনের ভেতরের জেদ আর আক্রোশটা অপমানের চাবুকে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। যেন খাঁচায় পুরে রাখা বাঘটাকে ক্রমাগত খোঁচাতে খোঁচাতে সহসা বাঘটা খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে এসেছে। যতীন এক ধাক্কায় লোকটাকে দরজার বাইরে ঠেলে দিয়ে ঘরে ঢুকে এল। খাটের কাছে নিচু হয়ে বসে চুলের মুঠি ধরে টেনে আনল গোবিন্দকে। গোবিন্দ কাটা মুরগীর মতো ছটফট করতে করতে বলল, 'বড়বাবু!'

যতীন সশব্দে একটা চড় গোবিন্দর গালে 'বসিয়ে দিয়ে চিৎকার

করে উঠল, 'খবরদার, ওই নামে আমায় ডাকবি না। তুই, তুই একটা কলঙ্ক। আয় আমার সঙ্গে, তোর ব্যবস্থা করছি।'

চুলের মুঠি ধরে যতীন টান দিল। গোবিন্দর সাধ্য ছিল না সই টানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। মেঝের ওপর তার শরীরটা ছ্যাচড়াচ্ছিল। গোবিন্দকে ছাড়া আর কারো দি:কে খেয়াল ছিলনা যতীনের। কিন্তু দরজার দিকে তাকাতেই সে .টর পেল মেয়েটা কখন যেন বাইরে গিয়ে লোক ডাকতে শুরু কারে দিয়েছে। খোলা দরজার সামনে তখন ভিড় জমতে শুরু করছে।

যতীন ভিড়টাকে উপেক্ষা করার ভঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে চাইল কিন্তু পারল না। একটা শক্ত হাত এসে তার ঘাড়ের কাছটা খামচে ধরল। যতীন মুখ ঘোরাবার আগেই শুনল মোটা গলায় আদেশের ভঙ্গিতে কেউ যেন বলছে, 'ওকে ছাড়ুন। ভাল চানতো ওকে ছাড়ুন।'

কথার সঙ্গে সঙ্গে যতীনেব কাঁধের কাছে লোকটার হাতের চাপ প্রবল হয়ে উঠছিল। যতীন গোবিন্দাকে ছেড়ে দিল। লোকটা একটানে যতীনকে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। যতীন শরীরের টাল সামলাতে পারল না। পাশের দেয়ালে তার হাতটা লেগে ঘসড়ে গেল। বারান্দার ভিড়টা যতীনের চারপাশে বৃত্তের মতো ছড়ানো। আস্তে আস্তে ভিড়টা ছোট হয়ে এল। ভিড়ের মধ্যে থেকে প্রথমে কেউ একটা ঘুষি চালালো। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশ থেকে এলোমেলো ঘুষি আর চড় উড়ে এসে পড়তে লাগল যতীনের ওপর। যতীন নিজেকে বাঁচাবার জন্যে দু'হাত ওপরে তুলে মুখটা আড়াল করতে চাইল। তখনই ভিড়ের মধ্যে আবার সেই গলাটাই গর্জন করে উঠল, 'এটা কি হচ্ছে। যে যার ঘরে যাও—যাও—।'

যতীন দেয়ালের দিকে সরে গিয়েছিল। এবার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে পড়ল। শক্ত চেহারার সেই লোকটা, যে যতীনের কাঁধটা খামচে ধরেছিল সেই লোকটা এগিয়ে এল সামনে। লোকটার মুখে ঘাম চিকচিক করছে। মুখ ভর্তি পান। গলায় সোনার চেন। পরনের ধুতিটা লুঙ্গির মতো করে পরা। আদ্দির পাঞ্জাবীর নিচে হাত-

কাটা নেটের গেঞ্জি। লোকটা যতীনের সামনে এসে দাঁড়াল। ভিড়টা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বারান্দার চারদিকে। লোকটা কর্কশ গলায় যতীনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি বে এ পাড়ায় বাওয়ালী করছিলি কেন ?'

যতীন আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। এবার সে টের পেল জেদের মাথায় সে বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এ পাড়ার রীতি নিয়ম সে জানে না। শরীরে আঘাত বেশি লাগেনি, কিন্তু মনের ভেতরটা অপমানে জ্বলে যাচ্ছে। যেন কয়েকটা লোক ইতর পায়ে তার বুকটাকে মাড়িয়ে দিয়ে গেছে। সারাবুক জুড়ে সেই জ্বালা। যতীন শান্ত অথচ গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি দুঃখিত। কিন্তু এ ছাড়া আমার আর করবারই বা কী ছিল!'

লোকটা বলল, 'কেসটা কী ?'

যতীন মনে মনে বুঝল, গোপন করে লাভ নেই। সত্যি কথাটা বলে দেওয়াই ভালো সে উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছিল। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আপনি শুনবেন ?'

লোকটা আড চোখে যতীনকে দেখতে দেখতে বলল, 'আলবৎ শুনবো।' যতীন চারপাশে ছড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলন, 'কিন্তু এখানেই ?'

লোকটা চারপাশে তাকাল। ভিড়ের মধ্যে থেকে দু'একজন সরে গেল। লোকটা বারান্দার লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখানে দাঁত না কেলিয়ে ঘরে বসো না বাপধনরা।'

কথাটা বলেই লোকটা খানিক এগিয়ে গিয়ে আরেকটা দরজার পাশে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'লতা তোর ঘরে লোক আছে।'

মেয়েটির জবাব শোনা গেলনা। লোকটা এগিয়ে এসে যতীনকে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।'

যতীন উঠে দাঁড়াল। লোকটা তাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায় যতীন জানেনা। কিন্তু লোকটাকে সব কথা বলা দরকার। লোকটাকে অনুসরণ করে যতীন পর পর দুটো দরজা পেরিয়ে এসে তৃতীয় দরজার

সামনে দাঁড়াল। লোকটা কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছে। যতীনকে ইশারায় ওপরে ডাকল।

চমৎকার সাজানো ঘর। মেঝের ওপর মোটা কার্পেট। দেয়ালের এক পাশে বড় সাইজের ড্রেসিংটেবিল। ভেতরের ঘর থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে। লোকটা সোফার ওপর বসতে বসতে বলল, 'কেসটা বলুন তো।'

যতীন ঘরে বসল না। দাঁড়িয়ে থেকে চারপাশটা দেখে নিয়ে বলল, 'এটা আপনার বাড়ি?'

লোকটা দেশলাইয়ের ওপর সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে বলল, 'এখানে সব বাড়িই মাগী বাড়ি। ন্যাকড়া ছেড়ে যা বলবার বলুন।'

যতীন ঘৃণার চোখে লোকটাকে দেখল। লোকটা নির্বিকার। আমেজ করে সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে চোখ বুঁজে টান দিচ্ছে। যতীন সংক্ষেপে গোবিন্দর ব্যাপারটা বলে ফেলল। লোকটার নির্বিকার মুখে কোন প্রতিক্রিয়া খুঁজে পেলনা যতীন। এখনও চোখ বুজে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেট টেনে যাচ্ছে। যতীন লোকটার জবাবের অপেক্ষা না করে বলল, 'আমি কি এখন যেতে পারি।'

লোকটা চোখ খুলল। যতীনকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ দিয়ে জরিপ করতে করতে হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনার কনুইটা বিশ্রিভাবে ছড়ে গেছে। দাঁড়ান—'

কথা থামিয়ে ভেতরের ঘরের দিকে চোখ তুলে ডাকল, 'লতা, তোর ডেটলটা নিয়ে আয়তো।'

যতীন এতক্ষণ বুঝতে পারেনি, এবার দেখল তার ডানহাতের কনুইটা সত্যিই অনেকখানি ছড়ে গেছে। তবুও লোকটাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও কিছু নয়, আমি গিয়ে ওষুধ লাগিয়ে নেব।'

লোকটা আবার ডাকল, 'লতা!'

ভেতরের ঘর থেকে এবার একটি মেয়ের গলা পাওয়া গেল। বিরক্ত এবং রুষ্ট সেই গলা, বলল 'ভাল্লাগে না বাপু, দাঁড়াও।'

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে মেয়েটি বলল, 'যত উদো মদো-মাতাল নিয়ে তোমার কারবার। এই নাও।'

যতীন মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি গ্রাহ্য করল না। লোকটাব কাছে এগিয়ে আসতে আসতে বলল, 'কই, কার কী ফেটেছে না কেটেছে?'

লোকটা হাত তুলে যতীনকে দেখাল। মেয়েটি তুলোতে ডেটল ঢেলে যতীনের কাছে এগিয়ে এসে কড়া গলায় ধমক দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'কই দেখি।'

যতীন চোখ ফিরিয়ে নিতে গিয়েও পারল না। মেয়েটির নাকে নাকছাবিটা জ্বলজ্বল করছিল। দাঁতে ঠোঁট চেপে ধরে যতীনের হাতে ডেটল ভেজা তুলোটা ঘষে ঘষে লাগিয়ে দিচ্ছে। যতীন চোখ ফেরাতে পারছে না। তার বুকের মধ্যে যেন একটা অন্ধকার গডাগডি করছে। সেই অন্ধকারের মধ্যে বিদ্যুতের চাবুকের মতো ঝলসে উঠেছে হারানো ছবি! যতীন অবাক চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কেমন গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নাম কি?'

মেয়েটা তীর্যক চোখে তাকাল। তারপর ফিক করে হেসে ফেলে সরে গেল লোকটার কাছে। যতীনকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল, 'ও পানুদা, এযে নাম জানতে চায়। বসবে বলে মনে হচ্ছে।'

পানু মানে ওই লোকটা মেয়েটার কথায় পাত্তা দিল না। সিগারেট ফুরিয়ে এসেছিল। সোফা থেকে উঠে গিয়ে গিয়ে টেবিলের অ্যাসট্রেতে সিগারেটটা নিভিয়ে ফেলতে ফেলতে বলল, 'নামটা বললেই তো হয়।'

মেয়েটা প্রথমে এক চোট হেসে নিয়ে বলল, 'আমার নাম লতা। তা এখানে কার ঘরে বসা হয়।'

পানু লতাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ম্যালা বকিস নেতো। ওর প্রেসের কর্মচারী বে-পাড়ায় নারীসঙ্গ করছে বলে তাকে সুপথে নিয়ে যেতে এয়েছে।'

লতা নাট্কে মেয়েদের ঢঙে গালে হাত দিয়ে বলে উঠল, 'হায়, রাম, সবাই সুপথে গেলে এপাড়া যে লক আউট হয়ে যাবে মাইরী!'

যতীন বুঝল এ পাড়ার ভাষা আলাদা। ভাল কথা বললেও দুটো খারাপ কথা না বলে উত্তর দিতে পারে না। মেয়েটার দিকে তাকাতে

ভরসা হচ্ছে না। তবুও না তাকিয়ে পারল না যতীন। ওর মুখ যতীনকে ভেতরে ভেতরে যন্ত্রণা দিচ্ছে, তবুও একটা আকর্ষণ আছে যা এই মুহূর্তে যতীন এড়াতে পারল না। যতীন দেখল লতা সোফার ওপর বসে পা নাচাচ্ছে। ভেতরের ঘর থেকে একটা হিন্দি গান ভেসে আসছিল, সেই গানের সুরে গা দোলাতে দোলাতে লতা যতীনের দিকে তাকাল। চোখের দৃষ্টিটা যেন যতীনকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ পা দোলানো থামিয়ে দিল লতা। তীক্ষ্ণ চোখে যতীনকে দেখছে। যতীনের শরীর ঘামতে লাগল। যতীন দরজার দিকে সরে যেতে যেতে কোন রকমে বলল, 'অনেক ধন্যবাদ! আমি যাই।'

দেড়তলা উঁচু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে কোন রকমে নেমে এল যতীন। সামনে যে গলি পেল সেটা ধরেই খানিকটা হেঁটে এসে দেখল একটা ফাঁকা রিকশা সওয়ারী নামিয়ে দিয়ে ফিরে যাচ্ছে। যতীন তাড়াতাড়ি গিয়ে রিকশায় চেপে বসে বলল, 'বড় রাস্তা।'

দু'মিনিটের মধ্যেই রিকশাওয়ালা যতীনকে বড় রাস্তায় এনে নামিয়ে দিল। যতীন পেছন ফিরে দেখল রাস্তাটাকে। এই রাস্তাই সোজা লতাদের ঘরের বারন্দায় গেছে। দমবন্ধ হয়ে আসছিল। যতীন আকাশের দিকে মুখ তুলে বাতাস পেতে চাইল। বাইরের বাতাসে তার মনে হল শরীর যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

॥ ৬ ॥

একটু রাত করে বাড়ি ফিরে এল যতীন। কলকাতার আকাশ অন্ধকায় হয়ে আসছে। হয়তো রাতের দিকে ঝড় উঠতে পারে। যতীনের মনে অবসাদ আর গ্লানি জড়িয়েছিল। নিজের বাড়িতে সে ঢুকল নিঃশব্দে। তার সারা শরীর অপমানে জ্বলছিল খানিক আগে। এখন সেই জ্বালা নেই বটে, কিন্তু আগুনে পোড়া কালো ছাই তার সারা বুকে ছড়িয়ে গেছে। যতীন অন্যদিনের মতো বারান্দা থেকে 'জেঠু' বলে সণ্টুকে ডাকল না। সিঁড়ির গোড়ায় উমাকে দেখে চোখ নামিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। গ্রীষ্মকালে রোজই বাড়ি ফিরে স্নান

করে যতীন। আজও স্নান করে ফিরে এসে কেষ্টকে ডাকল। গায়ের জামা আর পরনের ছাড়া কাপড়টা মেঝের ওপর পড়ে ছিল। কেষ্টকে সেগুলো দেখিয়ে বলল, 'এগুলো কালকেই কাচতে দিস।'

খেতে বসে যতীন টের পেল তার খেতে ভাল লাগছে না। হাতের ক্ষতটা পাঞ্জাবীর হাতার আড়ালে রাখতে পেরে সে খানিকটা স্বস্তি পেল। উমা রোজ খেতে দেয়, সে জানে কার কতটুকু লাগে। বড়দার থালার দিকে তাকিয়ে সে বলল; 'আপনি খাচ্ছেন না কেন বড়দা?'

যতীনের মনের মধ্যে জমে থাকা গ্লানি আর অবসাদ বাড়িতে পা দেবার পর একটা পাপের চেহারা নিয়ে ফেলেছে। উমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে তার সাহস হল না। একটা অপরাধবোধ তাকে কিছুতেই মাথা তুলতে দিচ্ছে না। সে শুধু বলল, 'আজকে শেষ বেলায় একটু বেশি টিফিন করে ফেলেছি, তাই খিদে কম।'

নিজের কানেই মিথ্যেটা কট শোনাল। যতীন জানে একটা মিথ্যে ক্রমাগত আর একটা মিথ্যেকে ডেকে আনে। চক্রবৃদ্ধি সুদের মতো মিথ্যে শুধু বেড়েই চলে। কিন্তু সত্যি কথাটা এখানে বলবে কেমন করে। নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই এখন জ্বলছে। সন্ধ্যের পর যে সব কাণ্ড ঘটেছে সে সব কথা এখানে বলা যায় না। যতীন খাওয়া শেষ করে উঠে এল নিজের ঘরে। তার মন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। গোবিন্দ কিংবা ওই পাড়ার সমস্ত ঘটনা ছাপিয়ে লতা নামের মেয়েটার মুখ তার বার বার মনে পড়ছে। আশ্চর্য মনে হচ্ছে যতীনের, যে মেয়েকে সে জীবনে কখনও দেখেনি, তাকে, সেই অচেনাকে তার এত চেনা মনে হচ্ছে কেন? কেন মনে হচ্ছে কবে, কোথাও যেন এরকম একটা মেয়েকে সে দেখেছে। তবে কি কখনও কোন ট্রামে কিংবা কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় দেখেছি। জলের ভেতর ডুব দিয়ে থাকলে যেমন পারের কোলাহল অস্পষ্ট হয়ে কানে বাজে তেমনই ভাঙ্গা ভাঙ্গা অস্পষ্ট ভাবে মেয়েটাকে সে চিনতে পারছিল। মেয়েটার তাকানো, দাঁতে ঠোঁট চেপে রাখা এবং মুখে হাত চাপা দিয়ে হেঁসে ওঠার অভ্যাসগুলো তাকে ভেতরে ভেতরে কাঁপিয়ে দিল। যেন অসম্ভব, অবাস্তব একটা চিন্তা তার ভেতরে খেলা করতে শুরু করছে। যতীন

সণ্টুকে একবার দেখে নিয়ে জানালার কাছে এল। বাইরে অন্ধকার আকাশ আরও অন্ধকার হয়ে গেছে। অন্ধকারে চাঁদ ঢেকে গেছে অনেক আগে। বাইরে বাতাস উঠছে। জানালায় দাঁড়িয়ে যতীন শুনল গলির মোড়ে হাওয়া লেগে দোকানের সাইবোর্ডগুলো শব্দ করে কাঁপছে। যতীন আজ কিছুই গ্রাহ্য করছে না। শূন্য দৃষ্টিতে অন্ধাকারের দিকে তাকিয়ে সে যেন কিছু হাতড়ে পেতে চাইছিল। ভোর রাতের ফিকে ঘুমের মধ্যে যে মায়াবী-আচ্ছন্নতা থাকে সেই রকম আচ্ছন্নতায় সে জড়িয়ে যাচ্ছিল। লতা নামের মেয়েটার চোখ অন্ধকারে জ্বলছে। যতীনের মনের মধ্যেও ঝড়ের মতো বেপরোয়া দামাল হাওয়া। হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে যতীনের মন। তিনসুকিয়ার বাড়িটা হাওয়ায় কাঁপছে। মনের মধ্যে কিছুই দুদণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছে না। কোন স্মৃতিকে ধরে রাখতে পারছেনা যতীন। তবুও অন্ধকার আকাশ আর বাইরের দামাল হাওয়ার দিকে তাকিয়ে আজ কেন বার বার অন্য একজনের কথা মনে পড়ছিল যতীনের। লতার সঙ্গে কি সীতার কোথাও মিল আছে? ওর চেহারায়, তাকানোর ভঙ্গিতে কিংবা ওই রকম দাঁতে ঠোঁট চেপে রাখার অভ্যাসে? হয়তো আছে, হয়তো সে কারণেই মেয়েটার মুখ বার বার মনে পড়ছে যতীনের। হয়তো ওই লতাও কারো মেয়ে কিংবা যতীনের মতো তারও কোন দাদা আছে। হয়তো দাদা জানে না কিংবা জেনেও জানান দেয়না বোন কোথায় অথবা কেমন করে তার দিন কাটে। হয়তো···

যতীনের ভাবনাটা থেমে গেল। 'হয়তো' দিয়ে একটা জীবনের গল্প ভেবে ফেলা যায়না। এই কষ্টকল্পনার কোন মানে নেই। পৃথিবীর প্রত্যেকটা মানুষই প্রত্যেকের থেকে আলাদা। তবুও কোন-কোন মানুষের সঙ্গে কোন কোন মানুষের হঠাৎ হঠাৎ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। লতার সঙ্গেও বুঝি সেই মিল খুঁজে পেয়েছে যতীন। কিংবা এমনও হতে পারে, সীতা এখনও যতীনের ভাবনার মধ্যে জড়িয়ে আছে। মৃত অথচ যতীনের স্মৃতিতে ভয়ঙ্কর ভাবে জাগ্রত। সেই ভাবনাটাই ভেতরে ভেতরে কাজ করছে বলে লতাকে হঠাৎ করে চেনা মনে হচ্ছে যতীনের।

যতীন জানালার কাছ থেকে সরে আসতে আসতে ভাবনাটাকে তাড়াতে চাইল। তার মন অশুচি হয়ে যাচ্ছে। দমকা হাওয়ার টানে জানালার পাল্লা দুটো সহসা বিকট শব্দ করে বন্ধ হয়ে গিয়ে আবার হাট হয়ে খুলে গেল। যতীন জানালাটা বন্ধ করতে করতে টের পেল বারান্দায় কেউ এসেছে। সম্ভবত উমা। চোখ ফিরিয়ে দেখল রোজকার মতো জলের গ্লাস নিয়ে উমা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। যতীন নিজেকে স্বাভাবিক করে তোলার তাগিদে বলে উঠল, 'ওকি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? এসো, ভেতরে এসো।'

উমা ঘরে ঢোকবার আগে একবার পেছনে তাকাল। সিঁড়ির গোড়ায় দীপু দাঁড়িয়ে। উমা মনে মনে হাসল। টেবিলের জলের গ্লাস রেখে রোজ যেমন চলে যায় আজ না গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। যতীন উমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'কিছু বলবে?'

উমা ইতস্তত করছিল দেখে যতীন বুঝল উমা বোধহয় কিছু বলতে চায়। যতীন বলল, 'বল না কী বলবে?'

উমা মাথা নিচু করে রেখেছিল, এবার আস্তে আস্তে মুখটা তুলে বলল, 'একটা কথা ছিল বড়দা।'

যতীন চেয়ারে বসে আরেকটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বলল, 'বসো, বল কী তোমার কথা।'

বাইরের বারান্দায় তখন দীপু উত্তেজনায় সিগারেট ধরিয়ে ফেলেছে। জয়ন্তী দীপুকে দেখে হাসতে হাসতে বলল, 'তোমার কেসতো এখন সুপ্রিমকোর্টে। উকিল তো ভাল, মনে হয় হয়ে যাবে।'

দীপু সিগারেটটা মুখ থেকে নামিয়ে নিয়ে বলল, 'মেজবৌদি তো বড়দার সামনে দিব্যি বসে পড়েছে। তোমার কী মনে হয়?'

জয়ন্তী অবাক হওয়ার ভান করে বলল, 'কী মনে হয় মানে?'

দীপু এগিয়ে এসে জয়ন্তীর মুখোমুখি দাঁড়াল। গলা নামিয়ে বলল, 'মানে মেজবৌদির এই বসে পড়াটা কী ইনডিকেট করছে? মানে সিগন্যাল গ্রীন অর রেড?'

দীপুর ছটফটানী দেখে জয়ন্তী মজা পাচ্ছিল। হাসি চাপতে চাপতে বলল, 'বসে পড়াটা মোটেও ভাল লক্ষণ নয় ভাই। ধর ট্রাম যদি

আউটলাইন হয় বা বিগড়ে যায় তাহলে ড্রাইভার তখন কী করে ?'

দীপু অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'কী করে।'

জয়ন্তী একই ভঙ্গিতে বলল, 'কেবিনঘরের মধ্যে বসে পড়ে। তার মানে তার দ্বারা কিছু হবেনা।'

দীপু বারান্দার থামে হেলান দিয়ে বলল 'প্লিজ বৌদি, ভরসা দিতে না পারো ভয় দেখিও না।'

জয়ন্তী শব্দ করে হেসে উঠেই মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসির শব্দটা আটকালো। দীপু এক বুক উদ্বেগ নিয়ে বড়দার খোলা দরজার দিকে তাকাল। মেজবৌদির পেছনটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। দীপু টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। দরজার পাশে কান পাততেই তার বুকের মধ্যে কাঁপন আরম্ভ হল।

যতীন তখন উমার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'জানি, মেয়েটির নাম ঝুমা। বেথুনে পড়ে। জাতিতে বেনে। বাপের অগাধ পয়সা '

উমার গলায় বিস্ময় উপচে এল, 'আপনি সব জানেন ?'

যতীন আবেগশূন্য গলায় বলল, যতটুকু বললাম ততটুকুই জানি। এটাকে কি সব জানা বলে।'

উমা বুঝতে পারছিলনা বড়দার মনোভাবটা কি। বড়দা এতসব জানলই বা কেমন করে। মেয়েটিকে উমার ভারি পছন্দ, দীপুও যখন ভালোবেসেছে তখন পিছিয়ে যাবার হয়তো উপায় নেই। যদি বড়দা রাজী না হন তাহলেই হয়তো ব্যাপারটার ইতি ঘটে যাবে। বড়দার অমতে দীপু বিয়ে করে এ বাড়িতে বৌ আনতে সাহস করবে না। বিশ্রি ব্যাপার হয়ে যাবে। তাই একটু চুপ করে থেকে উমা বলল, 'মেয়েটি দেখতে কিন্তু...'

উমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে যতীন বলে উঠল, 'দেখতে খুবই ভাল। বেশ স্মার্ট।'

উমা ক্রমশ ঘাবড়ে যাচ্ছিল। সে ভেবে পাচ্ছেনা বড়দা তার বলবার আগেই সব বলে দিচ্ছে কেমন করে। এর পর কোন কথা দিয়ে শুরু করবে ভাবতে গিয়ে সে সমস্যায় পড়ে গেল। 'দীপুর সঙ্গে একটি মেয়ের পরিচয় আছে, মেয়েটি'—শুধু এইটুকু বলতেই সব বৃত্তান্ত

বড়দা গড়গড় করে বলে দিয়েছে। উমা ঢোক গিলল। বড়দা টেবিলের ওপর রাখা প্রুফের বাণ্ডিল খুলছিল। উমা সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি রাত্রিবেলা কাজ করবেন?'

যতীন হাসতে হাসতে বলল, 'খানিকটা এগিয়ে রাখি। কাল রাত থেকে পড়ে আছে। বন্ধু-বান্ধবের কাজ নিলে নিজের দায়িত্বটা বেড়ে যায়।'

উমা আড়চোখে বড়দাকে দেখে নিয়ে বলল, 'দীপুতো সবার ছোট, আমাদের মত না নিয়ে ও কিছু করতে চায়না। তাই—'

এবারও উমা কথা শেষ করতে পারল না। যতীন কাজ করতে করতেই বলে উঠল, 'তাই তোমাকে ধরেছে। আর কেবলই তোমাকে তাগদা দিচ্ছে কথাটা আমার কাছে পাড়বার জন্য।'

উমার বিস্ময় তাকে কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক করে দিল। সে এমনটা স্বপ্নেও ভাবেনি। যেমন সে ভেবে এসেছিল তেমনটা একেবারেই ঘটছে না। তবু বেশিক্ষণ থেমে থাকার উপায় ছিলনা। এতটা এগিয়ে এসে থেমে যাওয়ার মানে হয় না। ঝুমার মুখটা মনে পড়ল উমার। কয়েকদিন আগে ঝুমা নিজেই ফোন করেছিল। মেয়েটাকে ফিরিয়ে দিতে উমার কষ্ট হবে। উমা স্বগতোক্তির মতো নিজেই আস্তে আস্তে বলল, 'যদি আমাদের পশ্চিঘর হতো তাহলে অবশ্য কোন সনস্যা হতো না'

যতীন হাসতে হাসতে বলল 'সমস্যাটা এখনই বা কোথায় হচ্ছে? তোমার পছন্দ, আমার পছন্দ আর তোমার দেওরের পছন্দ, ব্যস্, সব সমস্যাতো মিটেই গেল। এখন শুধু রথী আর বীথির মতামতটা নাও। জাত-পাত দেখে কী হতে, মানুষ দেখতে শেখ। মানুষই আসল।'

উমার হু'চোখ খুশিতে ভরে গেল। সে উঠতে উঠতে বলল, 'আপনি রাজী হয়েছেন শুনলে আপনার ভাইয়েরা আর কিছুতেই অমত করবেনা।'

উমা চলে যাচ্ছিল। যতীম ডাকতে ঘুরে দাঁড়াল। যতীন বলল, 'তোমার গুণধর দেওর নিশ্চয়ই তোমার জন্যে কোথাও অপেক্ষা করছে। তাকে শুধু বলে দিও অফিসে কাজের সময় যেমন ঝুমার

ঢোলকোল বলবল না যায়। আমি মুনাকে বেশ বলে দেয়, বড়দা ব্যাচেলার হয়েও ওদের প্রোবলেমটা ঠিক ঠিক বুঝতে পেরেছে।'

কথাটা বলেই যতীন হেসে ফেলল। বাইরের বারান্দায় কানে হাত চাপা দিয়ে লজ্জায় জিভ কাটল দীপু। তার মনে হল লজ্জা যে কখনও কখনও এত সুখের হয় তা আগে কোনদিন জানতে পারেনি।

প্রেসে এসে যতীন বুঝল তার পকেট ডায়েরীটা খোয়া গেছে। পাঞ্জাবীর পকেটেই ওটা থাকে। বাড়িতে গত রাত্রের পাঞ্জাবীর পকেটে খুঁজে না পেয়ে ভেবেছিল হয়তো প্রেসে ফেলে এসেছে। এখানেও খুঁজে না পেয়ে সে নিশ্চিত হল জিনিসটা হারিয়েছে। ডায়েরীটাতে আত্মীয়-স্বজন, নানা পাবলিশার্স আর পারটির ঠিকানা, ফোন সব লেখা থাকে। তার থেকেও জরুরী একটা জিনিস গতকাল পকেট ডায়েরীতে যতীন রেখেছিল। অসীমবাবু একটা বেয়ারার চেক দিয়েছিলেন সেটাও ওই ডায়েরীতে ঢুকিয়ে রেখেছিল যতীন। এরকম সাধারণত সে করেনা, তবু গতকালই সে ভুলটা করেছিল আর গতকালই তার মাশুল দিতে হল। হারানো ডায়েরীর কথাটা ভাবতে গিয়ে কাল সন্ধ্যেবেলার ঘটনাগুলো মনে পড়ল। ওই পাড়াতেই হয়তো পকেটমার হয়েছে কিংবা ধাক্কাধাক্কির সময় পড়ে গেছে। কেউ পেয়ে থাকলে নিশ্চই ফেরৎ দেবেনা। হারানো জিনিসটার খোঁজ করতে ওখানে যাওয়ারও কোন মানে হয় না। ডায়েরীটা পাওয়া যাবেনা, উল্টে আবার অপমান সহ্য করতে হবে। কোন কারণেই আর ওখানে যাওয়ার কোন অর্থ হয়না। তার চেয়ে অসীমবাবুকে ফোন করে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখা ভাল। উনি যদি ব্যাঙ্কে ফোন করে বলে রাখেন তবেই কিছুটা সুরাহা হয়। যতীন দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতে আরম্ভ করল। কিন্তু চাইবার সঙ্গে সঙ্গেই কোন জিনিস পাওয়ার উপায় নেই। বিরক্ত যতীন বার তিনেক চেষ্টার পর লাইনটা না পেয়ে ফোন নামিয়ে রেখে অপেক্ষা করতে লাগল। অপেক্ষা করতে করতে সে হিসেব করতে লাগল, যে লোকটা ওই চেক পাবে সে নিশ্চয়ই সকাল দশটার মধ্যেই চেকটা

ক্যাশ করবার জন্যে ব্যাঙ্কে আসবে। যতীন ঘড়ির দিকে চোখ রেখে সময় মাপতে মাপতে ভাবল, এখনই যদি অসীমবাবু মারফৎ ব্যাঙ্ক কে জানানো না যায় তাহলে লোকটাকে আটকানো, যাবেনা, চেকটাও বাঁচবে না। ভেতরে ভেতরে অধৈর্য যতীন ফোনের দিকে হাত বাড়াতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ফোনটা বেজে উঠল। যতীন মনে মনে খুশি হলনা। কিন্তু রিসিভার কানে লাগিয়েই সে অবাক হয়ে গেল।

'হ্যালো, যতীনবাবু আছেন?'

যতীন আস্তে করে বলল, 'আমি কথা বলছি।'

'আমি যতীনন্দ্রনাথ ঘোষকে চাইছি।'

যতীন আবার বলল, 'আমিই যতীন্দ্রনাথ ঘোষ।'

ওপাশ থেকে এবার ভেসে এল, 'আমি লতা। কাল সন্ধ্যেবেলা যেখানে এসেছিলেন, সেখান থেকে বলছি।'

যতীন চমকে উঠে ভাবল ফোনটা নামিয়ে রাখবে কিনা। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা পারল না। রিসিভারটা কানের সঙ্গে যতদূর সম্ভব চেপে ধরল। বুকের মধ্যে আবার ঝড় বইতে শুরু করছে। যতীতন কথা বলবার আগে ঘরের চারপাশে তাকল। বলল, 'বলুন কী দরকার।'

লতার গলা উচ্ছল হল। টেলিফোনে ওকে হাসতে শোনা গেল।

যতীনেয় বুকের মধ্যে যেন হাজারটা আগুনের বল লাফাচ্ছে। যতীন চাপা স্বরে টেলিফোনে ধমক দিয়ে বলল, 'আমার সময় নেই। যা বলবার তাড়াতাড়ি বলুন।'

লতার কণ্ঠস্বরে কোন পরিবর্তন এল না। আগের মতোই বলল, 'বেশি মেজাজ দেখাবেন না। আমি আপনার সঙ্গে পিরীত করবার জন্যে ফোন করিনি। কাল এখানে আপনি একটা ছোট ডায়েরী ফেলে গেছেন। বকুল কুড়িয়ে এনে আমাকে দিয়েছে।'

'ডায়েরীটা আপনি দেখেছেন?' যতীনের গলায় উদ্বেগ গাঢ় হল।

'আমার বয়ে গেছে দেখতে।'

'না দেখলে আমায় ফোন করলেন কেমন করে?' যতীনের গলায় অবিশ্বাস।

'আপনার প্রেমের গোবিন্দ না ফোবিন্দ সেই লোকটাতো কাল

রাতে বকুলের ঘরে ছিল। বকুলতো ওর হতে দিয়েহ ফেরৎ পাঠাতে চেয়েছিল, কিন্তু সে নিতে সাহস করল না। তাই আমাকে দিয়ে গেল।

যতীন তখনও অবিশ্বাসের গলায় বলল, আপনাকে দিতে গেল কেন। বকুল নিজেই তো ফোন করতে পারতো।'

এবার বোধহয় লতা রেগে গেল। গলায় ঝাঁঝ ঢেলে নাটুকে কায়দায় বলল, 'আহাঃ আপনার বুঝি বকুলে মন মজেছে। ও মাগীর ঘরে ফোন নেই। তাছাড়া ওর ধারণা কাল রাতে আপনি আমার ঘরে বসেছিলেন।'

যতীনের মনে হল টেলিফোনটা যেন তার কানের মধ্যে গরম লোহা ঢেলে দিল। সে নরম গলায় বলল, 'সেতো বসেছিলাম। আপনি শুধু দিলেন।'

লতার গলা তীক্ষ্ম ব্যাঙের মতো আছড়ে পড়ল, 'নেকু বুড়ো এ বসা সে বসা নয়। এ বসা মানে শোওয়া।'

যতীন ভয়ে ভয়ে ঘরের চারদিকে তাকাল। ফোনটা নামাতে পারছে না। মেয়েটা অনর্গল খারাপ কথা বলে যাচ্ছে। যতীন নিজেকে মনে মনে শক্ত করে নিয়ে বলল, 'ডায়েরীটা ফেরৎ পাঠাতে পারেন?'

লতাও নিজের গলা গম্ভীর করে জবাব দিল, 'আমার লোক নেই। যদি দরকার বোঝেন নিজে আসবেন।'

যতীন এবার অসহায় গলায় বলে ফেলল, 'দেখুন কিছু মনে করবেন না। আমার ওখানে যেতে ভয় করে।'

লতার হাসি শোনা গেল। হাসি থামিয়ে বলল, 'দুপুরবেলা চলে আসুন, কোন ভয় নেই। বড়রাস্তা থেকে পেট্রোল পাম্পের পাশ দিয়ে ঢুকে বাঁ হাতের প্রথম গলি। গলির শেষেই শিবমন্দির। আমি বারান্দায় থাকব।'

কথা শেষ করেই টেলিফোন ছেড়ে দিল লতা। যতীন টলিফোন নামাবার শেষ শব্দটাও শুনল। তার কপাল ঘেমে গিয়েছিল। রুমাল বার করে ঘাম মুছল। তার মনে হল গলাও শুকিয়ে এসেছে।

জল খেতে খেতে সে টের পেল মেয়েটা আর দশটা খারাপ মেয়ের মতোই, তবুও বোধহয় ওর মধ্যে এখনও একটুকরো ভাল থেকে গেছে। তা নইলে কোন কবে ডায়েরীটা ফেরৎ দিতে চাইতো না। ওরা তো টাকার জন্যেই সব করে, অথচ ওই ডায়েরীটার মধ্যেই হাজার টাকার একটা বেয়ারার চেক ছিল। ইচ্ছে করলে টাকাটা অনায়াসেই আত্মসাৎ কবতে পারত। যতীন মনে মনে মেয়েটির প্রতি কৃতজ্ঞ হল।

॥ ৭ ॥

বারান্দায় সিঁড়ির মুখেই লতা দাঁড়িয়েছিল। দিনের বেলা জায়গাটার চেহাবা একদম বদলে গেছে। গতকাল সন্ধ্যাবেলা যখন নিমাইয়ের পেছন পেছন এই খোলা চাতালটায় এসে পড়েছিল যতীন তখনকার সঙ্গে এখন এই জায়গাটার চেহারায় বা চরিত্রে কোন মিল নেই। চাতালের ওপর খান দুই খাটিয়া পাতা। তারই একটাতে মুখে গামছা চাপা দিয়ে মোটাসোটা মতন একটা লোক শুয়ে। বোধহয় ঘুমোচ্ছে। এক তলার অধিকাংশ ঘরের দরজাই খোলা। খোলা দরজার সামনে সেজে-গুজে এখন আর কেউ দাঁড়িয়ে নেই। রাত্রির বাতাসে এখানে অচেনা একটা গন্ধ ভেসে বেড়ায়, যেটা কাল টের পেয়েছিল, আজ সেটা টের পাওয়া গেল না। একটা মেয়ে চাতালের একপাশে দাঁড়িয়ে কাঁচের-গ্লাসে করে চা খাচ্ছিল। মেয়েটার বাঁ হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। যতীন মাথা নিচু করে চাতালটা পেরিয়ে গেল। সে টের পেল চারপাশের কয়েক জোড়া কৌতূহলী চোখ তার দিকে তাকিয়ে। সামনের দিক থেকে কেউ আসছিল। যতীন সরে দাঁড়োতে গিয়ে দেখল মাঝ বয়েসী একজন মহিলা পরনের সায়াটাকে বুকের ওপর অনেকটা তুলে বেঁধেছে। চুল খোলা। হাঁটুর নিচ থেকে আর কোন বস্ত্র নেই। দাঁত মাজতে মাজতে যতীনের গা ঘেষে চলে গেল। যাবার সময় বোধহয় লতাকে লক্ষ্য করে বলল, 'ভর দুপুরে বাবু বসাচ্ছিস নাকি?'

লতা ফিক করে হেসে উত্তরদিল, 'ওভারটাইম করছি টগরদি।'

যতীনের কান ঝাঁ-ঝাঁ করে উঠল। মনে হতে লাগল নর্দমার পাক কেউ যেন তার সর্বাঙ্গে ছিটিয়ে দিয়ে গেল। বুকের মধ্যে থেকে একটা ঘেন্না পর্যন্ত ঠেলে উঠল। লতা যতীনের দিকে তাকিয়ে শুধু হাসল, তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে বলল, 'আসুন।'

যতীন দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। লতা ভেতর থেকে ডাকল, 'কই ভেতরে আসুন।'

যতীন বাইরে থেকে উত্তর দিল, 'ভেতরে যাবার দরকার নেই। ডায়েরীটা দিন।'

লতা দরজার সামনে ফিরে এল। তার চোখে রাগ। গলায় শ্লেষ ফুটিয়ে বলম, 'ঘরে আসতে ঘেন্না না চরিত্র হারাবার ভয়।'

লতার চোখের দিকে তাকাতেই যতীন ধরতে পারল গতরাত্রের ঝড়টা তার বুকের মধ্যে ফিরে আসছে। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো উথাল পাথাল হচ্ছে তার রক্ত। লতার মুখের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারল না যতীন। যেন স্বপ্নের মতো এক আচ্ছন্নতায় সে ঘরে এল। লতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন কেন? আমি কি দেখতে খুব সুন্দরী?'

লতা তির্যক দৃষ্টিতে যতীনের দিকে তাকাল। যতীনের বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ঘূর্ণি হাওয়ায় গাছের শুকনো পাতার মতো তার মন, তার স্মৃতি তার সমস্ত ফেলে আসা দিনগুলো তালগোল পাকিয়ে গিয়ে বুকের মধ্যে ঘুরতে আরম্ভ করে দিয়েছে। যতীনের কাছে কিছুই স্পষ্ট হচ্ছে না, ভাবতে খারাপ লাগছে তবুও নেই অবিশ্বাস্য ভাবনাটাই বার বার তার মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে কেন? লতা ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর চলার ভঙ্গি, কথার ধরন, কণ্ঠস্বর, ওর মুখের আদল এমন কি সোফায় বসে পা দোলানো সব মিলে মিশে এই অচেনা মেয়েটা যেন চেনা হয়ে উঠছে। যাকে এ জীবনে মাত্র দু'দিনের বেশি দেখেনি সেই দূরের মানুষটাকে তার এত কাছের বলে কেন মনে হচ্ছে! সূঁচের মতো প্রশ্নগুলো যতীনের হৃদপিণ্ডে বিঁধে যাচ্ছিল। একটা বিস্মৃত গানের কলির মতো, যার

সুরটা মনে পড়ছে অথচ বাণীটা স্মরণে আসছে না—সেই অস্বস্তি, যা গত রাত্রেও তাকে আচ্ছন্ন করেছে এখনও আবার তাকে ক্রমাগত অস্থির করে তুলতে লাগল।

লতা ততক্ষণে ড্রয়ার থেকে লালরঙের ছোট্ট ডায়েরীটা বার করে এনেছে। লতার হাতে ডায়েরীটা ধরা। যতীন হাত বাড়াল। লতা ডায়েরীটা ফেরৎ দিতে দিতে বলল, 'টেলিফোনে আপনাকে একটু মিথ্যে বলেছি। ডায়েরীটা বকুল পেয়েছিল্ল ঠিকই। ওই নেড়ে চেড়ে দেখেছে। আমিও খানিকটা দেখছি। ওর ভেতরে একটা চেক আছে, দেখে নিন '

যতীন হয়তো দেখে নিত, কিন্তু লতা বলতে দেখতে সঙ্কোচ হল। না দেখেই পকেটে রাখতে রাখতে বলল, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এই ডায়েরীটা খব জরুরী আমার কাছে।'

লতা সোফায় বসে পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'কোলড ড্রিংকস খাবেন ?'

যতীন মাথা নেড়ে বলল, 'না, থাক।'

লতার চেখে-মুখে বিদ্রূপ ঝিলিক দিয়ে উঠল। বলল, 'কেন, চরিত্র খারাপ হয়ে যাবে ?'

যতীন আগের মতোই মাথা নেড়ে বলল, 'সে রকম আশঙ্কা আর এ বয়সে নেই।'

লতা যেন মজা করবার লোভেই গলাটাকে আরো তীক্ষ্ণ করে বলল, 'বৌ বকবে ?'

যতীন এবার হেসে ফেলল। মেয়েটাকে তার খুব নাবালিকা মনে হচ্ছে। সে বলল, 'না, সে বালাই নেই। আমি বিয়ে করিনি।'

লতা ঠোঁট ওলটালো। পাশের ঘর থেকে একজন আয়া গোছের মহিলা দুটো গ্লাস নিয়ে ঘরে এল। লতা গ্লাস দুটো দেখিয়ে বলল, 'বীয়ার খাবেন ?'

যতীন মনে মনে ভাবল, মেয়েটা তার সহিষ্ণুতা দেখে প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। সে গলা গম্ভীর করে উত্তর দিল, 'আমি ওসব খাইনা। আমার কোন নেশা নেই।'

খিলখিল করে হেসে উঠল লতা। হাসি থামিয়ে বলল, 'নিজে মুখে বলছেন ব্যাচেলর অথচ কোন নেশা নেই! তারমানে আপনি দেবতা না হয় অতিশয় খচ্চর টাইপের লোক মাইরি।'

আয়া মেয়েটির টেবিলে দুটো ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল রেখে চলে গেল। লতা দুটো বোতলের মুখ খুলে গ্লাসে ঢালল। একটা গ্লাস যতীনের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ইচ্ছে হলে খান নাহলে ফেলে দিন।'

নিজের গ্লাসটা গালের ওপর চেপে ধরে লতা যতীনের দিকে চোখ কুঁচকে তাকাল। লোকটাকে দেখতে বেশ লাগে লতার। কাল রাতে পানুদার সঙ্গে যখন ঘরে এল তখন লোকটাকে দেখেই চমকে উঠেছিল। বেচারা! কিচ্ছু না জেনে পরের ভাল করতে এসে ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিল। বোধহয় সেই জন্যেই একটু মায়া হয়েছিল লতার। এ পাড়ায় যারা আসে তাদের সঙ্গে লোকটার কোন মিল নেই। নিপাট ভালোমানুষের মতো মুখ, সরল চাউনি। ওর চোখের দৃষ্টিতে কোন পাপ নেই। লতা পুরুষ মানুষের চোখের ভাষা বোঝে। চোখের দিকে তাকিয়ে অনেকের মনের নকশাকে দেখতে শিখেছে লতা।

গালে গ্লাস চেপে রাখা লতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যতীন টানটান হয়ে বসল। তার মধ্যে কৌতূহলটা ক্রমশ অবাধ্য হয়ে উঠছে। হঠাৎ সে গ্লাসটা চুমুক দিল। লতা ঠোঁট টিপে হাসল। যতীন মুখের কাছ থেকে গ্লাসটা নামিয়ে নিয়ে বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন তাহলে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি কি?'

লতা বলল, 'কথাটা কি?'

যতীন বলল, 'আপনার বাবার নাম কি?'

লতা অবাক হওয়ার ভঙ্গি করে বলল, 'লাও ঠ্যালা! আপনিই বোধহয় প্রথম পুরুষ যে এ পাড়ায় এসে বাপের নাম জিজ্ঞেস করলেন। কোন কোন বেওকুফ অবশ্য স্বামীর নাম জানতে চায়।'

লতা প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছে ভেবে যতীন বলল, 'আপনি গান জানেন? রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদের গান?'

লতার মুখের হাসিটা ফিকে হয়ে এল। যতীনের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি বিয়ের ঘটক। আমার বিয়ের পাত্র খুঁজেবেন নাকি ?'

হারানো গানের সুরটা বার বার ফিরে ফিরে আসছে। আছড়ে পড়ছে যতীনের বুকের মধ্যে, অথচ বাণীটা কিছুতেই মনে আসছে না—সেই অস্বস্থি আবার ঘিরে ধরল যতীনকে। যতীন গ্লাসে আরেকটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা নামাল। লতা তার দিকে তাকিয়ে। মেয়েটার মুখ যেন আয়না। যতীনের মধ্যে ছায়া ফেলতে শুরু করেছে। ওর চিবুকের তিল, বাঁ দিকের ভ্রুর ওপর সামান্য কাটা দাগ, নাকের গড়ন সব যেন একটা অবিশ্বাস্য ঘটনাকে বিশ্বাস্য করে তুলতে সাহায্য করছিল। যতীন দুম্ করে বলে বসল, 'আপনি কখনও তিনসুকিয়াতে ছিলেন ?'

গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছিল লতা। যতীনের প্রশ্নে হঠাৎ সে বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ থেকে যেন আগুন ছিটকে বেরোচ্ছে। কড়া গলায় সে চিৎকার করে উঠল, 'কে আপনি ? আমার এত খোঁজে আপনার কিসের দরকার ? আমাকে নিয়ে আর একটা প্রশ্ন করলে দারোয়ান ডেকে আপনাকে ঘর থেকে বার করে দেব।'

যতীন দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ঘরে তো আমি আসতে চাইনি। আপনিই তো ডেকে এনেছেন।'

লতা যতীনের কথার উত্তর দিলেনা। যতীন দেখল লতা দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ওর মুখ দেখতে পেলনা যতীন। মনে মনে শুধু ভাবল এখন তার চলে যাওয়াই উচিত। এর পরে হয়তো, লতা আরও অসম্মান করতে পারে। কিন্তু খোলো দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে যতীনের হঠাৎ মনে হল, তিনসুকিয়ার কথা বলতেই লতা অমন জ্বলে উঠল কেন ? যতীন থেমে গেল। তার মধ্যে ঘুর্ণি হাওয়াটা প্রবল হয়ে উঠছে। যেন বিবর্ণ অ্যালবামের পাতাগুলো এলোমেলো হওয়ায় ক্রমাগত খুলে যাচ্ছে তার চোখের সামনে। বাবাকে মনে পড়ল যতীনের। মা'র মুখটা স্পষ্ট হয়ে আসছে।

অন্ধকার রাতে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তিনসুকিয়ার কোয়ার্টার্সে মা'র সেই চাপা কান্নাটা কানের কাছে হঠাৎ গুমরে উঠল। যতীন পেছন ফিরে তাকাল। আয়নায় লতার মুখ। লতার চোখ যতীনের দিকে। যতীন মুখ নামিয়ে ফেলে বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না। মেয়েদের প্রতি আমার আলাদা কোন দুর্বলতা নেই। কোন রকম আসক্তিও কোন দিন অনুভব করিনি। কিন্তু আপনাকে আমার অন্যরকম লাগে।'

'কেন?' অনেক দূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর লতার। যেন পারঘাটে দাঁড়িয়ে অন্ধকার নদীর বুকে প্রশ্নটাকে ভাসিয়ে দিল।

যতীন অস্থিরভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ঠিক জানি না, ঠিক বুঝতে পারি না। আপনার ভেতরে আমি একজন হারানো মানুষের ছায়া দেখতে পাই। কী আশ্চর্য মিল!'

যতীনের কণ্ঠস্বর ভিজে এল। মাথা নিচু করে যতীন খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেল। লতা দেখল, মনুষটা সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছে। চাতাল পেরিয়ে গলির মধ্যে ঢুকে গেল। খোলা দরজা থেকে ঘরের মধ্যে ফিরে আসতে আসতে লতা টের পেল লোকটার কথাগুলো নতুন নয়। রাতের বেলা অনেক মাতাল গায়ে হাত বেলাতে বেলাতে এরকম অনেক কথা তাকে শোনায়। কিন্তু এই লোকটা মাতাল নয়। লোকটার চোখে ভোরবেলার মতো নরম আলো। ওর কথাগুলো এক ঝাঁক জোনাকি হয়ে তার বুকের মধ্যে আলো জ্বেলে জ্বেলে উড়ে বেড়াচ্ছে কেন? কেন নাভিমূল থেকে উঠে আসছে একটা তীব্র যন্ত্রণা—! লতা বিমূঢ়ের মতো খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে রইল।

॥ ৮ ॥

খাবার টেবিলে কথাটা তুলল দীপু। খেতে খেতে নাটকীয় ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়িয়ে দীপু বলল, হাউসের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে। আমি পেশ করছি।'

যতীন ছাড়া ব্যাপারটা সবারই জানা ছিল যতীন তাই অবাক চোখে দীপুকে দেখল। গত ক'দিন থেকে একটা চিন্তা তাকে ঘূণ পোকার মতো কেবলই কুরে কুবে খাচ্ছে। বুকের ভেতরটা রক্তাক্ত হয়ে গেলেও সে মুখে তা প্রকাশ করতে পারছে না। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। দীপুর কথায় সে নিজেকে গুছিয়ে নিল। দীপু ততক্ষণে বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে, 'আমাদের বড়দা আগামী ছয়ই আগস্ট পঞ্চাশ বছরে পা দিচ্ছে। তারমানে একটা গ্লোরিয়াস অ্যাণ্ড ফাইটিং হাফ সেনচুরি। আমরা এটাকে খুব ঘটা করে পালন করতে চাই।'

যেন মহড়া দেওয়াই ছিল তেমনভাবে ঘরের সবাই একসঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠব, 'দারুণ প্রস্তাব। আমরা সবাই মেনে নিচ্ছি।'

যতীন কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সবাই মিলে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠল, 'তোমাব কথা এ ব্যাপাবে শোনা হবে না। হাউসের ডিসিশন তোমাকে মানতে হবে।'

যতীন দীপুর মতো উঠে দাঁড়াল। বলল, 'এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না। মিছিমিছি টাকা খরচ।'

দীপু বড়দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'জীবনে অনেকগুলো দিনতো বড়দা তুমি শুধু আমাদের সবার জন্যে খরচ করেছ। আজ যদি সবাই মিলে তোমার জন্যে শুধু একটা জন্মদিন করে আনন্দ পেতে চায় সেই আনন্দটুকু তুমি বন্ধ করে দিওনা।'

যতীন বসে পড়ল। তাব বুক ভেসে যাচ্ছে অমল হাওয়ার যেন জ্যোৎস্নার প্লাবন তাকে ঘিরে। এক বুক আনন্দ নিয়ে ঘরে এল যতীন। জীবনের অনেকগুলো দিন ধীরে ধীরে পেছনে সরে গেছে। সেই দিনগুলো আর কোন মূল্যেই ফিরে আসবে না। যতীন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখল। পঞ্চাশ বছরের একটা মানুষ। ভায়েরা ঘটা করে তার জন্মদিন করবে। একটা নতুন জিনিস ঘটতে চলেছে এই বাড়িতে। যতীনের মুখটা আয়নায় ফেটে ফেটে যাচ্ছে। সে দেখতে পাচ্ছে তিনসুকিয়ার কোয়ার্টার্সে দশ বছরের একটা ছেলের জন্মদিন হচ্ছে। ছোট্ট একটা মেয়ে তার মা'র শাড়ি-

পরে। ডল পুতুলের মতো দেখাচ্ছে তাকে। চন্দনের থালা নিয়ে এগিয়ে এসে হাঁটু গেড়ে বসল তার সামনে। দাদাকে চন্দন দিয়ে সাজাচ্ছে মেয়েটা। কপালে টিপ পরাতে পরাতে বলল, 'আমার জন্মদিনে কিন্তু তুই আমাকে সাজাবি।'

ছেলেটা কপালে চন্দনের ফোঁটা পরতে পরতে বলল, 'আজকে আমায় তুমি কী দিবি?'

মেয়েটা চোখ তুলে হাসল। বলল, 'যখন দেব তখন দেখবি। আগে বলতে নেই।'

এই মেয়েটাই সেইদিন দাদাকে বলেছিল, 'দাদা আমায় একদিন শিউপুরের চা বাগান দেখাতে নিয়ে যাবি?'

যতীন চোখ বুজে ফেলল। তার বন্ধ চোখের তারায় লতার মুখটা ভেসে এল কেন? কেন লতাকে মনে পড়ছে তার? যতীন আবার ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল। কিসের একটা দুর্বোধ্য টান আছে মেয়েটার মুখে যা কিছুতেই যতীন এড়াতে পারছে না। মেয়েটি যদি ও পাড়ায় না থাকতো, যদি কোন ভদ্র পরিবেশে ওর সঙ্গে আলাপ হতো তাহলে নিজের কথাটা হয়তো যতীন বুঝিয়ে বলতে পারতো। এখানে ওর যন্ত্রণা মেয়েটা হয়তো বুঝবে না। হঠাৎ একটা দুর্ঘটনার মতো মেয়াটা তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে আর যতীনের ভেতরটা কেবলই এলোমেলো করে দিচ্ছে। মানুষে মানুষে এত মিল তো যতীন আগে কখনও দেখেনি।

যতীন প্রেসে এসে দেখল জয়দেব মাইতি বসে আছে। ভদ্র-লোকের চোখে মুখে ঝড় থেমে যাওয়ার পরের অবস্থা। যেন ভাঙ্গা গছের মতো আধখানা হয়ে যাওয়া একজন মানুষ। যতীনের কণ্ঠস্বরে ব্যাকুলতা স্পষ্ট হল, 'কী ব্যাপার মাইতি মশাই?'

বিপন্ন চোখ তুলে জয়দেব মাইতি যতীনকে দেখল। মাথাটা নামাতে নামাতে বলল, 'গোবিন্দর মেসে গিয়ে ওকে পেলাম না। শুনলাম এখানেও সে আসছে না। ওকে একটা খবর দেওয়া দরকার।'

যতীন বলল, 'কী খবর?'

জয়দেব মাহাত মুখ তুলল না। টেবিলের দিকে তাকিয়ে যেমন বসেছিল তেমনই বসে থাকল কয়েক সেকেণ্ড। তারপর থেমে থেমে বলল, 'কাল সকালে বৌমা মারা গেছে। বোধহয় ফলিডল খেয়েছে। বডি এখনও কাঁথির লাশকাটা ঘরে। খবরটা গোবিন্দকে জানানো দরকার।'

যতীন কয়েক মুহূর্তের জন্য পাথর হয়ে গেল। তার মনে হল শরীর ঠাণ্ডা—অসাড় হয়ে আসছে। ঘরে বোধহয় একফোঁটা বাতাস নেই। জয়দেব মাইতির মুখের দিকে সে আর তাকাতে পারছে না। নিজেকে সামলে নিতে খানিকটা সময় নিল যতীন। তারপর বলল, 'ওর মেসে নিমাইকে দেখলেন?'

জয়দেব মাইতি দীর্ঘশ্বাসটা চাপতে চাপতে বলল, নিমাই খবর পেয়েই রওনা হয়ে গেছে। উপায় না দেখে আমি আপনার কাছে এলাম। আমি এখনই ফিরে যাব। আপনি যেদিন ওর দেখা পাবেন সেদিনই ওকে খবরটা জানিয়ে দেবেন।'

জয়দেব মাইতি উঠতে গিয়ে বলল, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। একটু জল খাওয়াতে পারেন।'

যতীন নিজের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন।'

জলটা এক চুমুকে শেষ করে জয়দেব মাইতি উঠে দাঁড়াল। যতীন ভাল করে তাকাতে পারছিল না। নিজেকেই তার খুব ছোট মনে হচ্ছে যেন হেরে যাওয়া মানুষ যতীন। তবু উঠল, আস্তে আস্তে জয়দেব মাতির পাশে এসে দাঁড়াল। তার হাত কাঁপছিল। কম্পিত হাতে জয়দেব মাইতির হাতটা টেনে নিয়ে বলল, আপনাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মুখ আমার নেই। আপনি এই টাকা কটা সঙ্গে রাখুন। এটা গোবিন্দর রোজগার নয়, আমি দিচ্ছি আমার মরা মেয়ের জন্য এই ভেবে আপনি গ্রহণ করুন।'

জয়দেব মাইতির চোখ ভিজে এল। কথা বলতে গিয়ে স্পষ্ট করে করে কিছু বলতে পারল না। তার ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

যতীন অসাড় হয়ে বসে রইল। তার কোন কাজেই মন লাগছিল না। বুকের ভেতর একটা শূন্যতা অনুভব করল। যেন দামাল

হাওয়ায় তার শরীরের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠছে। গোবিন্দকে এখন, এসময় কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে সম্পর্কে যতীনের কোন ধারণা নেই। হয়তো সন্ধ্যের পর গোবিন্দ বকুলের ঘরে যাবে। নর্দমায় মুখ গুঁজে জীবনের সুখ খুঁজবে আহাম্মকটা। আর ওদিকে কাঁথির লাশ কাটা ঘরে ততক্ষণে কাটা ছেঁড়া চলবে সাবিত্রীর দেহটার। জীবন কখন কোথায় কেমনভাবে শেষ হয়ে যায় সে কথা মানুষ বুঝতে পারে না। এসময় সাবিত্রীর সবচেয়ে কাছের মানুষটাই বেপাত্তা হয়ে রইল। জীবনের অনেক দুঃখ আর বঞ্চনার মধ্যে ডুবতে ডুবতে শেষপর্যন্ত বোধহয় মরীয়া হয়ে উঠেছিল সাবিত্রী। যতীনের ভেতর একটা হাহাকার স্পষ্ট হয়ে উঠে তাকে ঘিরে ফেলল। যতীন আস্তে আস্তে নিজেকে সামলে নিতে গিয়ে টের পেল তার মধ্যে প্রবল ঘৃণার সঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে একটা ভয়ঙ্কর আক্রোশ। গোবিন্দর কোন ক্ষমা নেই। ঘৃণা আর আক্রোশের দৃষ্টিতে সে গোবিন্দকে দেখল।

সন্ধ্যার পর যতীন প্রেস থেকে বেরিয়ে এল। জায়গাটা তার চেনা অতএব পৌঁছে যেতে কোন অসুবিধা হল না। আজ তার মধ্যে কোন দ্বিধা ছিল না। চাতালের সামনে এসেই বকুলের দরজার দিকে তাকল। তার চোখ বাঘের মতো জ্বলছে। ঘরের ভেতর থেকে হারমোনিয়মের আওয়াজ আসছিল। যতীন এগিয়ে যেতে যেতে দেখল পানু আসছে। পানুকে দেখে যতীন দাঁড়াল। পানুর মুখ ভর্তি পান। বাঁ হাতের মুঠিতে ধরা জ্বলন্ত সিগারেট। মুঠি পাকিয়ে সিগারেটে টান দিয়ে পানু এগিয়ে এল যতীনের কাছে। বলল, 'কী ব্যাপার! আজকেও ঝামেলা করতে এয়েছেন মনে হয়?'

যতীন পানুর লাল চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, আমি কোন ঝামেলা করতে আসি নি। গোবিন্দকে আমার দরকার।'

পানু গলগল করে যতীনের মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বলল, 'গোবিন্দ এখানে এলেই বুঝি তাকে আপনার দরকার হয়। বেশি ন্যাকড়া না করে সরে পড়ুন না হয় কোন খালি ঘর দেখে ঢুকে যান।'

যতীন বুঝল আসল কথাটা পানুকে না বললে গোবিন্দকে পাওয়া সহজ হবেনা। যতীন পানুকে হাত তুলে বোঝাবার ভঙ্গি করে বলল, 'গোবিন্দকে আমার নিজের কোন দরকার নেই। আমি এসেছি একটা খবর দিতে। দেশে ওর বৌ ফলিডল খেয়ে মারা গেছে। বডি এখন কাঁথির লাশকাটা ঘরে। এই খবরটুকু জানাতেই আমার এখানে আসা।'

সিগারেট টানতে গিয়ে পানু থেমে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে যতীনের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। তারপর সহসা ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাকল, 'বকুল! এ্যাই বকুল!'

বকুলের ঘরের দরজা খুলে গেল। দরজায় পানু আর যতীনকে দেখে বকুল বলে উঠল, 'আই বাপ্‌রে! বুড়ো বুঝি বসতে এয়েছে।'

পানু গলা খাটো করে ধমক দিল। যতীন দূরে দাঁড়িয়েছিল। সিঁড়ির ওপর থেকে লতার গলা শোনা গেল, এ্যাই পদ্ম, ইদিকে আয় তো!'

যতীন মুখ ফেরাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল। লতা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে হাসছে। যতীন আবার ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠল। এক ধাপ নিচে নামল লতা। হাত তুলে যতীনকে ডাকল। যতীন সে আহ্বান এড়াতে পারল না। যেন তার নিয়তি তাকে আস্তে আস্তে লতার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে একটি যেয়ে লতার গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলে গেল, 'লতাদি কী বুড়াটোকে বসাচ্ছিস?'

লতা শুধু হাসল। যতীন সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে থেমে গেল। পানু ফিরে আসছে। যতীনের কাছে এসে বলল, 'গোবিন্দ এখনও আসেনি। যদি আসে তাহলে ওকে ঘাড়ে রদ্দা দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেব। আপনি চলে যান।'

যতীন কথা বলবার আগেই লতা বলে উঠল, 'চলে যাবে কি গো! আমার যে ওকে দরকার।'

পানু পিচ করে পানের পিক ফেলে বলল, 'তোর ঘরে লোক নেই? তোরে বাঁধা বাবু?'

লতা দু'হাতে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বলল, 'আজ আসবে না। ব্যাবসা সামলাতে ধানবাদ গেছে।'

পানু সিগারেট টানতে টানতে বারান্দা পেরিয়ে গেল। লতা তরতর করে নিচে নেমে এসে বলল, 'কী হল? ওপরে আসুন'

যতীন চারপাশে তাকিয়ে বলল, 'মাপ করুন। আমি আপনার খদ্দের নই, আমায় যেতে দিন।'

যতীনের গলা কাতর শোনাল। লতা যতীনের হাত ধরে ফেলল। স্থির চোখে তাকিয়ে ছিল যতীনের মুখের দিকে। এবার জেদের গলায় বলল, 'যেতে দেব বলে তো ডাকছি না। আপনাকে আমার দরকার—খুব দরকার।'

লতা হাত ধরে টানল। বারান্দায় দাঁড়ানো কয়েকটা মেয়ে দূর থেকে দৃশ্যটা দেখে খিলখিল করে অশ্লীল হাসি হাসল। লতা কোন কিছুই গায়ে মাখল না। ঘরে এসে দরজাটা বন্ধ করে দিতেই যতীন চাপা গলায় গর্জন করে উঠল, 'একি! দরজা বন্ধ করলেন কেন? আমি কি আপনার কাস্টমার?'

লতার ঠোঁটে চেপে রাখা হাসি। বন্ধ দরজার দিকে পিঠ রেখে লতা বলল, 'ঘরে এলেই বুঝি কাস্টমার হয়!'

যতীন বুঝতে পারছে না মেয়েটা তাকে নিয়ে এখন কী করতে চাইছে। ওকে ঘিরে যতীনের মধ্যে একটা অসহায় দুর্বলতা আছে। মেয়েটার মুখ তাকে ভীষণ ভাবে টানে। ভেতরে ভেতরে দুর্বোধ্য একটা যন্ত্রণা দেয়। কিন্তু তাই বলে এতটা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে সেটা যতীন ভাবেনি। উত্তেজনায় এবং রাগে তার শরীর কাঁপতে লাগল। সে পকেটে থেকে পার্স বার করে কম্পিত হাতে তার থেকে একশো টাকার দুটো নোট টেনে বার করল। নোট দুটো এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই নিন। আমি জানি এর জন্যেই আপনারা সব করেন। এটা নিয়ে আমাকে দয়া করে ছেড়ে দিন।'

উত্তেজনায় ঝড়ের মতো কথাগুলো বলে গেল যতীন। মেয়েটার প্রতি তার দুর্বলতা সে ঝেড়ে ফেলতে চাইছিল। ওর মুখের মধ্যে যাকে সে দেখতে পায় তার কোনমতেই আর বেঁচে থাকার কথা নয়।

পারেকেও সে এখানে এই কদর্যতার মধ্যে একটা মুহূর্তও থাকতো না।

লতার ঠোঁটের ওপর থেকে হাসিটা মিলিয়ে গেল। তার দুই চোখ সহসা তীব্র হয়ে উঠল। যতীনের হাত থেকে টাকাটা ছিনিয়ে নিয়েই যতীনের মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'দয়া দেখাবার জন্যে এ শহরে অনেক লোক আছে। পুরুষমানুষের দয়ার মুখে আমি লাথি মারি। আপনি কি ভেবেছেন আমি আপনাকে রাত কাটাবার জন্যে ডেকে এনেছি। আপনাকে আমি কাস্টমার ভাবছি? আমাদের কি শরীর ছাড়া আর কিছু থাকতে নেই। বেশ্যার কি মন নেই? তার কোন বাসনা নেই, জিজ্ঞাসা নেই?,

কিন্তু যতীন দেখল লতার দু'চোখে জল। ভেতরের কান্না ঠেকাবার তাগিদে সে দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে রেখেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে তার বুক দ্রুত ওঠানামা করছে। নাক ফুলে ফুলে উঠছে। নাকছাবিটা মুহূর্তের জন্যে ঝিলিক দিয়ে উঠল। যতীনের বুকের মধ্যে ঝড় শুরু হয়ে গেছে। আহত বিস্ময়ে যতীন লতার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সে চোখ সরাতে পারছে না। তার স্মৃতি যেন বুকের মধ্যে হোমের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই আগুনে তার বুক পুড়ে যাচ্ছে। ঝরাপাতার মতো মন উড়ে যাচ্ছে পেছনের দিকে। যতীন এক পা এগিয়ে এল। লতার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কে?'

আহত বাঘিনীর মতো ছিটকে উঠল লতা, 'আমি লতা, লতা, লতা। আমি একজন নষ্ট মেয়েছেলে। আপনারা যাদের ঘেন্না করেন আমি তাদেরই একজন।'

যতীনের আচ্ছন্ন ভাবটা হোঁচট খেল। মেয়েটা যেন পলাতকা পাখির মতো। কখনও মনে হয় খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এখনও মনে হয় অনেক দূরের। চেনা-অচেনার মাঝখানে মেয়েটা ক্রমাগত দুলছে। বার বার বদলে যাচ্ছে তার রূপ আর বার বারই নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে যতীন। ভয়ানক কষ্টকর সেই যুদ্ধ।

লতা চোখের জল মুছে নিয়ে আয়নার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। যতীন গালিচার ওপর থেকে নোট দুটো কুড়িয়ে নিয়ে বলল, 'আপনি

আমায় ক্ষমা করুন। আপনাকে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।'

লতা ঘুরে দাঁড়াল। তার দু'চোখে তখনও রাগ। যতীনকে ওই রাগের চোখে দেখতে লাগল। কারো দৃষ্টির সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা অস্বস্তিকর। যতীন নিজেকে সহজ করে তোলবার তাগিদে সোফায় বসল। পাশের ঘর থেকে সেই আয়াটি এল। তার হাতে ছোট একটা কাঁচের গ্লাস। অন্যহাতে জলের জাগ। লতা ছোট গ্লাসটা নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে গ্লাসটা আয়ার দিকে এগিয়ে দিল। জাগ থেকে জল ঢেলে দিল মেয়েটি। লতা জলটুকু খেয়ে গ্লাসটা আবার হাতে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'ভয় নেই, আমি মদ খেয়ে মাতাল হ'চ্ছিনা। এটা ওষুধ।'

যতীন সহানুভূতির গলায় প্রশ্ন করল, 'আপনার কি অসুখ?'

লতা ঠোঁটের ওপর থেকে জল মুছে নিয়ে বলল' 'ডাক্তার তো তাই বলছে।'

যতীনের চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। তবু খানিক আগে মেয়েটির চোখে জল দেখে মনে মনে নিজেকে অপরাধী মনে হয়েছে। সেই কারণেই বলতে হল, 'কী অসুখ'।

লতা ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল সেই হাসিতে।

যতীন টের পেয়েও চুপ করে রইল। লতা আয়নার দিকে পেছন ফিরে টুলের ওপর বসতে বসতে বলল, 'বোধহয় ডাক্তার এখনও ধরতে পারেনি। আপনার ভয় নেই, রোগটা ছোঁয়াচে নাও হতে পারে।

যতীন হাসতে হাসতে বলল, 'ছোঁয়াচে রোগে আমার ভয় নেই।'

লতা আগের মতোই হেসে বলল, 'আপনার ভয় তো আমাকে নিয়ে। আমি ঘরে এনে যদি আপনার চরিত্র খারাপ করে দি।'

যতীনের কাছে একথার কোন জবাব ছিল না। এখানে আসতে যে তার খরাপ লাগে সেটা যত সত্যিই হোক, কথাটা এখন আর মেয়েটাকে বলা যায় না। হয়তো যতীনকে আদৌ সে চোখে মেয়েটা দেখে না। তবু কেন সে যতীনকে ডেকে এনে ঘরে বসাল? লতার মুখটা প্রথমদিন দেখবার পর থেকে যতীন ভুলতে পারেনি।

মনে মনে এই মুখটা সে অনেকবার দেখেছে। সেই দেখার মধ্যে কোন পাপ নেই। কোন প্রবৃত্তির তাড়নাও নয়। একটা অবিশ্রান্ত ভাবনা তাকে ভেতরে ভেতরে তাড়া করে ফিরেছে। কৌতূহলটা যেন চুম্বকের মতো তাকে টেনে আনছে এখানে। তেমন কোন কৌতূহল কি লতার মধ্যে কাজ করছে?

যতীন স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞেস করবার সাহস পেলনা। শুধু লতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি ডেকে এনেছেন তাই এলাম। কেন থেকেছেন তা কিন্তু বলেন নি। আমি কি এবার উঠতে পারি?'

লতা শাড়ির আঁচলের একটা অংশ দাঁতে চেপে বলল, 'আপনাকে আটকে রেখে আমার লাভ নেই। শুধু একটা কথা জানতে চাই?'

যতীন বলল, 'কী কথা?'

লতা আঁচলটা দাঁত থেকে সরিয়ে নিয়ে বলল, 'সেদিন আপনি জানতে চেয়েছিলেন না, আমি কখনও তিনসুকিয়াতে ছিলাল কিনা।

যতীন চমকে উঠে সোজা হয়ে বসল,। বলল, 'হ্যাঁ চেয়েছিলাম। আপনি কি কখনও তিনসুকিয়াতে ছিলেন?'

লতার চোখের খর দৃষ্টি নিস্তেজ হয়ে এল। যতীনের মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'যদি বলি ছিলাম, তাহলে আপনি খুশি হবেন?'

যতীনের বুকের মধ্যে ঝড় বইতে শুরু করেছে। সে বলল, 'আমার খুশি হওয়ার কথা নয়। আমি শুধু জানতে চাই।'

লতা উঠে দাঁড়াল। যতীনকে দেখল। উল্টোদিকের চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'ভারতবর্ষের এত জায়গা থাকতে শুধু তিনসুকিয়া নিয়ে আপনার প্রশ্ন কেন? আপনি ওখানে থেকেছেন?'

যতীন দেখল লতার চোখ তীরের মতো তাকে বিদ্ধ করে রেখেছে। লতাকে এখন অনেক বেশি রহস্যময়ী মনে হচ্ছে তার। সে নিজের সঙ্গে কথা বলবার মতো আস্তে আস্তে বলল, জীবনের অনেকগুলো বছর তিনসুকিয়াতে কাটিয়েছি। তিনসুকিয়াতেই সবচেয়ে বড় সর্বনাশ ঘটে গেছে আমাদের।'

লতা দৃষ্টি সরাল না। যতীনের দিকে একই ভাবে তাকিয়ে

প্রশ্ন করল, 'সর্বনাশ কেন ?'

যতীন মাথা নামাল। লতার দৃষ্টি ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। যতীন বলল, 'সে কথা আপনাকে বলা নিরর্থক। আপনার মুখের দিকে তাকালে সেই সর্বনাশের যন্ত্রণা আমি নতুন করে অনুভব করি।'

লতা উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে বলল, 'সে জন্যেই বুঝি আপনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন ?'

যতীন মাথা নেড়ে উত্তর দিল, 'ঠিক তাই। আপনাকে দেখলে আমার আরেকজনের কথা মনে পড়ে। দু'জনের আশ্চর্য মিল আছে

লতা পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে। আয়নায় যতীনকে দেখা যাচ্ছে লতা আয়নার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'সেই আরেকজন কে ?'

যতীন দু'হাতে নিজের মাথা চেপে ধরে বলল, 'তার কথা শুনে আপনার লাভ নেই।'

লতা মুখ ফেরাল না। আয়নার দিকে তাকিয়ে যতীনকে দেখতে দেখতে জেদের গলায় বলল, 'তার কথা না বললে আপনাকে আমি যেতে দেব না। আপনি কি চান একটা হাঙ্গামা হোক।'

যতীন কাতর গলায় বলল, 'আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের জায়গাটা নিয়ে আপনি কেন অন্যায় জেদ করছেন।'

লতার মুখ আগের মতোই আয়নার দিকে ফেরানো। যতীন লতার মুখ দেখতে পেলনা। লতা বলল, 'প্রত্যেক মানুষের জীবনেই একটা গোপন ক্ষত থাকে। আমারও আছে। তাই একটু মিলিয়ে দেখতে চাইছি। আপনাকে বলতেই হবে।'

যতীন দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে রইল। লতা আয়নার মধ্যে দিয়ে যতীনকে দেখতে লাগল। যতীন আস্তে আস্তে মুখটা তুলে বলল, 'আপনাকে দেখলে যার কথা মনে পড়ে সে আমার ছোটবোন তিনসুকিয়াতেই তাকে অকালে হারিয়েছি।'

আয়নার দিকে মুখ রেখে লতা এক পা এগিয়ে গেল। যতীন সোফাতে শরীর এলিয়ে দিয়ে বসেছে। লতা প্রশ্ন করল, 'আপনার বোনের নাম কি ছিল ?'

যতীন জবাব দিল 'সীতা।'

লতা আচমকা ঘুরে দাঁড়াল। যতীন দেখল ঘরের মধ্যে লতার শরীর কাঁপছে। যতীন সোফা থেকে উঠে এগিয়ে গেল। বলল, 'আপনি কি অসুস্থ?'

লতা যতীনের কথার কোন উত্তর না দিয়ে পর্দা ঠেলে পাশের ঘরে গেল। যতীনের বুকের মধ্যে ঝড়ের শব্দ। লতাকে ঠিক বুঝতে পারছে না। ওর এভাবে চমকে ওঠার মানে কি? যতীন সোফার কাছে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই লতা ঘরে এল। ওর মুখ অন্যরকম দেখাচ্ছে। লতা চেয়ারে বসল। তার হাতে জলের গ্লাস। একটা ট্যাবলেট মুখে দিয়ে জল খেল। যতীন বুঝতে পারছে না মেয়েটা আর কী জানতে চায়। লতা বলল, 'আপনার বোন সীতা এখন কোথায়?'

যতীন লতার দিকে না তাকিয়েই বলল, 'সে মারা গেছে।'

লতার চোখ যেন আগুনের মতো জ্বলছে। থমথমে গলায় সে প্রশ্ন করল, 'কোথায় মারা গেছে? তিনসুকিয়াতে? আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন?'

যতীন ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল। বলল, 'না তিনসুকিয়াতে নয়। বাবার সঙ্গে বেনারস বেড়াতে গিয়ে সীতার ম্যানেঞ্জাইটিস হয়েছিল। বেনারসেই সীতা মারা যায়।'

চেয়ার ছেড়ে ছিটকে দাঁড়াল লতা। আয়াকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। ঘরের মধ্যে এলোমেলো ঘুরল কয়েকবার। তারপর যতীনের সামনে এসে বলল, 'যে মরে গেছে তাকে নিয়ে আর এত ভাবনা কেন। আপনি কি আমার মুখের মধ্যে তাকেই খুঁজেন?'

যতীন উদাস গলায় বলল, 'আপনার সঙ্গে যে তার অনেক মিল। যেন যমজ বোনের মতো। তাই তো প্রথম দিন আপনাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম।'

লতা পিঠের ওপর থেকে চুলের বেণীটাকে টেনে বুকের ওপর আনল। চুলের ডাগাটায় আলতো ভাবে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, 'যদি এমন হয়, আপনার সেই বোন সীতা, সে হয়তো আসলে মরেনি, আজো বেঁচে আছে। যদি সে ফিরে আসে তাহলে?'

যতীন অবিশ্বাসের হাসি হাসল। বলল, 'সেতো সম্ভব নয়। যদি তেমন অসম্ভব ঘটে তাহলে বুঝতে হবে ঈশ্বর পরম করুণাময়।'

লতা অধৈর্য গলায় বলল, 'ঈশ্বরের করুণার কথা পরে হবে। আগে বলুন আপনি কী করবেন?'

যতীন অবাক গলায় বলে উঠল, 'কী করব মানে? এটা কি আবার বলে দিতে হবে নাকি। আমার বোনকে আমি বাড়ি নিয়ে যাব।'

লতা যতীনকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে লক্ষ্য করে কঠিন গলায় বলল, 'আপনি যদি আপনার বোনকে এই পাড়ার কোন ঘরে খুঁজে পান তাহলেও কি তাকে বাড়ি নিয়ে যাবেন?

যতীনকে চমকে দিল লতার কণ্ঠস্বর। চোখ তুলে দেখল লতা তার দিকে তাকিয়ে। অবিকল সীতার মতো ভঙ্গিতে সে তাকিয়ে আছে। যতীন বলল, 'নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। কিন্তু সীতা কখনও এপাড়ায় থাকতে পারে না। সীতাকে আমি জানি।'

বুকের ওপর টেনে আনা বেনীটাকে বাঁ, হাত দিয়ে পিঠের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে লতা উঠে দাঁড়াল। আয়নার দিকে সরে যেতে যেতে বলল, মেয়েদের অনেক জ্বালা যতীনবাবু, সে জ্বালা বাইরে থেকে কোন পুরুষমানুষের বোঝার সাধ্যি নেই। আপনি কি ভাবেন এপাড়ার সব মেয়েই বেশ্যা হয়ে জন্মেছে। কেউ কেউ হয়তো বেশ্যার ঘরের, কিন্তু সবাই তা নয়। কেউ কেউ ইচ্ছায় আর কেউ অনিচ্ছায় এপথে এসে যায়। এঁদের কারো কারো আপনার মতো দাদা আছে, অসহায় বাবা আছে, বিপন্না মা-ও আছে। মেয়ের রোজগারে খায় কিন্তু মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সাহস নেই।'

যতীন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে উঠে পড়ল। লতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এসব কথা আমাকে শুনিয়ে লাভ নেই। আমি অন্যরকম মানুষ।'

লতার গলা যেন শান দেওয়া ছুরির ফলার মতো ঝসসে উঠে বলল, 'অন্যরকম মানে কতটুকু আর অন্যরকম। সমাজের নিয়মের বাইরে তো যেতে পারবেন না। যদি দেখেন আপনার বোন সীতা

এপাড়ায় ঘর নিতে বাধ্য হয়েছে তাহলে তাকে সব জেনেও ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মতো অন্যরকম মানুষ কি হতে পারবেন আপনি ?'

যতীন দেখল লতা প্রশ্নের জবাব পাবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। যতীন লতার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। মেয়েটা ক্রমশ যেন সীতা হয়ে উঠতে চাইছে। জেদী মেয়েটা পেয়ারা গাছের নিচে যেমন করে ঘাড় বেঁকিয়ে স্থির চোখে দাদার দিকে তাকাত, লতাও যেন তেমন করে তাকিয়ে আছে। কখনও কখনও মেয়েটা অবিকল সীতা হয়ে যায়। ওর চোখের তারায় হারিয়ে যাওয়া দিনগুলো অলৌকিক ভাবে ফিরে আসে। যতীন ঘরের অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি সমাজ মানি কিন্তু তার সব সংস্কার আমি বিশ্বাস করিনা। আমার বোনকে যদি এই নরকেও খুঁজে পাই তাহলেও তাকে মাথায় করে ঘরে নিয়ে যাব। শরীরের পাপটাই মানুষের আসল পাপ নয়। ওর যতটুকু গেছে তার বেশি যেন না যায় সেজন্যেই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।'

লতা চোখ নামাল। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল দরজার দিকে। দরজার ছিটকিনি খুলে দিতে দিতে বলল, 'আপনার কথাগুলো যেন সমাজ সংস্কারকের বক্তৃতার মতো। ভোটের সময় আমরা দু'কান ভরে এসব বক্তৃতা শুনি।'

যতীন দরজার সামনে এসে বলল, 'আমি ভোট চাইতে আসিনি। আমি শুধু নিজের বোনকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই, কেন চাই সেকথাই বললাম। আপনার দাদা থাকলে, যদি তাকে চিনতাম তাহলে তাকেও এই কথা বলতাম।'

লতা দরজা খুলতে গিয়ে থেমে রইল। থেমে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর দরজাটা খুলে দিয়ে বলল, 'আপনাকে এই নরকে আটকে রাখলাম বলে মাপ করবেন। কিন্তু কী করব।'

যতীন দরজা পেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। লতার চোখ চিকচিক করছে। যতীন সস্নেহে লতার দিকে তাকিয়ে নরম গলায় বলল, আপনাকে ঠিক সীতার মতো দেখতে। বিশ্বাস করুন,

আপনার সামনে থাকলে মনে হয় না এপাড়ায় আছি। আপনার মধ্যে আমি আমার হারানো দিনগুলোকে ফিরে পাই, আমার বোনকে খুঁজে পাই।'

লতার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। গলার কাছে একটা কষ্ট ঠেলে উঠতে চাইছে। দরজায় গাল চেপে লতা বলল, 'আমাকে আপনার বোন ভাবতে ঘেন্না করবে তাই না?'

যতীন হাসল। তার মনে হল সীতা তার সামনে দাঁড়িয়ে। চোখের জলে গাল ভিজে যাচ্ছে সীতার। যতীন হাত বাড়িয়ে গালের ওপর থেকে জল মুছে দিয়ে বলল, 'ছিঃ, ঘেন্না করব কেন? তোমাকে বোন ভাবতে আমার ভাল লাগবে। আমার বোন সীতা তো তোমার মতোই দেখতে ছিল।'

দরজায় মুখ চেপে ধরল লতা। কান্নার দমকে তার শরীর ফুলে ফুলে উঠছে। যতীন অবাক চোখে লতার দিকে তাকাল। লতা মুখ তুলছে না। যতীন আস্তে করে বলল, 'আমি যাচ্ছি।'

লতা মুখ তুলে তাকাল। তার সারা মুখে কান্না। ঠোঁট চেপে কান্না থামাতে থামাতে বলল, 'এই বোনের জন্যে আবার কখনও এই নরকে আসবেন?'

যতীন নিঃশব্দে হাসল। লতার কান্না ভেজা চোখের দিকে চোখ রেখে বলল, 'বোন যদি কখনও তার দরকারে ডাকে তাহলে না এসে উপায় কি।'

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে যতীন পেছনে তাকিয়ে দেখল খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে লতা দু'হাতে মুখ ঢেকে কান্না আটকাচ্ছে।

॥ ৯ ॥

তিনভাই আর দুই বৌতে মিলে গোটা বাড়িটাকে যেন উৎসব বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। যতীনের বড় লজ্জা করতে লাগল। একটা জন্মদিনকে ঘিরে এরা যেন বাড়াবাড়ি করছে। রথী আর দীপুতো

অফিস-কামাই করে ফেলেছে। গোটা বাড়িতে একটা হৈ-হৈ কাণ্ড ঘটাচ্ছে এরা। যতীন দেখল রিকশাভ্যানে করে ডেকোরেটারের দোকান থেকে ভাড়া করা চেয়ার এল। বড় বড় গামলা, কড়াই, বালতি এল আরেকটা ভ্যানে। ওরা যে ভেতরে ভেতরে এত আয়োজন করে ফেলেছে সে কথা ঘুণাক্ষরেও যতীনকে জানতে দেয়নি। যতীন নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করল। উমা দোতালার বারান্দায় জয়ন্তীর সঙ্গে কথা বলছে। যতীন চোখ ঘুরিয়ে দীপুকে খুঁজল। খানিক আগে ভ্যানওলার সঙ্গে ওকে কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। ভাব দেখে মনে হচ্ছে আজ সন্ধ্যেবেলায় যেন এবাড়িতে বিয়ে কিংবা বৌভাত। নাটের গুরু হচ্ছে দীপুটা। যতীন বারান্দায় এল। ভেতরের উঠোনে ডাঁই করে চেয়ার পাতা। সন্টু একটা চেয়ার সাজিয়ে বসেছে। বীথির দেড় বছরের মেয়েটাকেও আদর করে চেয়ারে বসাতে চাইছে সন্টু। এক গাদা ডিনার প্লেট কলতলায় ধুতে লেগে গেছে কেষ্ট। যতীন উঠোনে নেমে এল। সন্টু পাশের খালি চেয়ারটা দেখিয়ে বলল, 'জেঠু এইটাতে বসো।

যতীন নিঃশব্দে এসে বসল। এখান থেকে রথীন আর বীথিনের ঘটনা পরিষ্কার দেখা যায়। দীপুকে দেখতে পেল যতীন। বরকর্তার মতো বাস্তুতা দীপুর মধ্যে। বৌদিদের সঙ্গে কি একটা গভীর আলোচনায় মেতে আছে। যতীনকে বোধহয় ওপর থেকে কেউ লক্ষ্য করেনি। যতীন নীচ থেকে গলা উঁচু করে ডাকল, 'দীপু!'

দীপুর সঙ্গে সঙ্গে উমা আর জয়ন্তীও নিচে তাকাল। ওরা ঘোমটা তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। যতীন ডাকল, 'তোমরা তিনজনেই নিচে এসো।'

ওরা নিচে নেমে এল। যতীন চেয়ারে বসে। বীথিনের মেয়ে পম্পা জেঠুর কোলে চেপে বসেছে। ওকে একলা চেয়ারে বসতে দেয়নি যতীন। উমাই প্রথমে বলল, 'আজ কিন্তু আপনার প্রেসে যাওয়া হবেনা বড়দা।'

যতীন তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমরা এটা কি আরম্ভ করেছ? এতো লোক হাসানো ব্যাপার হচ্ছে।'

উমা সবার হয়ে জবাব দিল, 'লোক হাসানো হবে কেন? আমরা আপনার জন্মদিন করছি। যেমন ভাবে ইচ্ছে তেমন করেই করছি, এতে লোক হাসবে কেন?'

যতীন উঠোনের চারদিকে ছড়ানো আয়োজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এত সব দেখে তো মনে হচ্ছে এটা বিয়ে বাড়ি। একটা সাধারণ লোকের জন্মদিনে এত কাণ্ড কেউ করে? তোমরা বুঝি বিস্তর লোককে নেমন্তন্ন করেছ?

উমা দীপুর দিকে দেখে নিয়ে বলল, 'বিস্তর কোথায়। আমাদের আত্মীয়-স্বজন, দীপু আর আপনার ভাইয়ের বন্ধুরা, পাড়ার কয়েকটা বাড়ি।'

সেন্টু চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল, 'আমার ইস্কুলের বন্ধুরাও আসবে।'

যতীন উমার দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল, 'মোট কতজনকে বলেছ?'

উমা যেন মনে মনে হিসেব করে বলল, 'কত আর, এই ধরুন পঁচাত্তর থেকে একশো।'

যতীন অবাক চোখে উমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'করেছ কি! এত লোকের রান্না-বান্না কে করবে? কত টাকার ব্যাপার সেটা হিসেব করেছ।'

এতক্ষণে দীপু জবাব দিল, 'রান্না-বান্নার ঝামেলা নেই। ক্যাটারিং সিসটেম। নর্থ ক্যালকাটার বেস্ট ক্যাটারারকে আনছি। মেটেরিয়ালস আমরা সাপলাই করব।'

যতীন প্রশ্ন করল, 'রথী কোথায়?'

উমা উত্তর দিল, 'ঠাকুরপোর গাড়ি নিয়ে মাছ আনতে গেছে।'

যতীন ক্রমশ অবাক হয়ে যাচ্ছিল আর ভেতরে ভেতরে একটা লজ্জা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলছিল। দীপু উৎসাহ পাওয়া গলায় বলে উঠল, 'আইটেম লিস্টটা একবার শুনবে বড়দা?'

যতীন চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'তোকে জুতো পেটা করব। তুই-ই হচ্ছিস নাটের গুরু। পাড়ার লোকে ভাববে লোকটার

বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়েছে। ঘটা করে নিজের জন্মদিন করছে।'

দীপু অবাক হতে গিয়ে হেসে ফেলে বলল, 'শোন বৌদি বড়দার কথা শোন। মেজদা এলে শুনে নিও পাড়ার লোক খবরটা শুনে কত খুশি হয়েছে। ক্লাবের ছেলেরা যেচে এসে বলেছে বড়দার জন্মদিনে আমরা যাব। ওরা তোমার জন্যে স্পেশাল ফুলের তোড়া অর্ডার দিয়েছে। ফুলসেট বিবেকানন্দ রচনাবলী কিনেছে ক্লাবের ফাণ্ড থেকে। তুমি তো ওদের ভাইস প্রেসিডেন্ট।'

দীপু কথা শেষ করে বৌদিদের দিকে তাকাল। জয়ন্তী বলল, 'আপনি ওরকম ভাবছেন কেন? আমাদের আত্মীয়-স্বজনরা এই ব্যাপারটা খুব ভাল ভাবে নিয়েছে। আমার বাবা তো বিশেষ কোথাও যান না। তিনি পর্যন্ত আপনার ভাইকে বলেছেন, দারুণ জিনিস হচ্ছে। যত কাজই থাক, আমি সেদিন যাবই।'

যতীন উমায় দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার বাড়ি থেকে কেউ আসছেন নাকি?'

উমা হাসতে হাসতে বলল, 'ওরা সবাই খুব খুশি হয়েছে। বাবা হয়তো আসতে পারবেন না। দাদা বৌদি আসবেন।'

দীপু বলল 'তোমার প্রেসের লোকদেরও মেজদা আজ নেমন্তন্ন করে আসবে।'

যতীন চেয়ারে বসতে বসতে উমা আর জয়ন্তীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সবাইকে যখন বললে তখন ঝুমাকে আর বাদ দিলে কেন? এই সুবাদে বাড়ির সবার দেখা হয়ে যেত।'

দীপু তখনই অকারণে কেষ্টর প্লেট ধোওয়া নিয়ে ব্যস্ত হবার ভান করে সরে গেল। উমা ওর চলে যাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাদ দিইনি তো, ওকেও বলেছি।'

যতীন মুচকি হেসে বলল, 'কে নেমন্তন্নটা করল? তুমি না দীপু।'

উমা হাসতে হসতে মুখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'দুজনেই। টেলিফোনে কথা বলেছি।'

যতীন আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গি করে বলল, 'ভালই করেছ।

তবে একদম কামাই করতে পারব না। একবার কিছুক্ষণের জন্য প্রেসে যেতে হবে। কয়েকটা জরুরী কাজ আছে।'

উমা আবদারের গলায় বলল, 'কিন্তু তিনটের মধ্যেই চলে আসবেন। লোকজন সবাই পাঁচটা থেকে আসতে শুরু করবে।'

যতীন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'সেটা করা যাবে। তোমরা এতকাণ্ড করছ আর আমি তিনটেয় আসতে পারব না।'

কথা বলতে বলতে যতীন উঠে পড়ল। তার স্নানের সময় হয়ে গেছে। উমা জয়ন্তীকে লক্ষ্য করে বলল, 'সেজ আমার ঘর থেকে নতুন তোয়ালেটা বড়দাকে এনে দে। আমি নতুন কাপড় এনে ঘরে রাখছি।'

যতীন যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এখনই নতুন কাপড় কেন?'

জয়ন্তী উত্তর দিল, 'আজকের দিনে সব নতুন পরতে হয়, আপনার তিনভাইতো তিনখানা কাপড় এনেছে।'

যতীন ভেতরে ভেতরে মুগ্ধ হয়ে গেল। যেন তার সারা মন জুড়ে ছড়িয়ে যেতে লাগল ফাল্গুনের হাওয়া। পূর্ণিমার আলোয় ভেসে যেতে থাকল তার সারা বুক আর হৃদয়।

যতীন প্রেসে আসবার আগেই বীথিন গাড়ি করে এসে নেমন্তন্ন সেরে গেছে। যতীন প্রেসে এসে সেটা জানতে পেরেছিল। অতএব, তিনটের মধ্যে ওদেরও ছুটি চাই। ম্যানেজার পরেশবাবু নিজে এসে ছুটির কথা বলে গেছে। যতীন কাজকর্মের কথা একবার তুলেছিল কিন্তু লতিফ সহ সবাই বলেছে, কাজের জন্য ভাবনা নেই। আমরা বেশিক্ষণ থেকে কাজ তুলে দেব। ওভারটাইম দিতে হবে না। সুতরাং তিনটে বাজবার আগেই প্রেস ফাঁকা হয়ে গেল। নিজের ঘরে বসে যতীন ঘড়ি দেখল। তিনটে বাজতে বাকি নেই। এখনই উঠে পড়া দরকার। টেবিলের কাজ গোছাতে গোছাতে যতীনের মনে পড়ল তিনসুকিয়ার দিনগুলোর কথা। তখন কত অনাড়ম্বর ভাবে যতীনের জন্মদিন হতো। তিনসুকিয়া ছাড়বার পর ওদের সংসারে একটা

অসুখ বাসা বেঁধেছিল। বাবাকে আর যেন কাছের মানুষ মনে হতো না। কথা বলা একদম কমিয়ে দিয়েছিলেন। মা-শুধু মাঝে-মধ্যে সীতার জন্য কাঁদত। বাবা থেকে থেকে উদাস হয়ে যেতেন। হঠাৎ হঠাৎ তার বুক চিরে বেরিয়ে আসতে এক-একটা দীর্ঘশ্বাস। সীতার সঙ্গে সঙ্গে এবাড়ির সুখ আর আনন্দটাও যেন চলে গিয়েছেল। মা শুধু কাঁদতো। যখন কাঁদত না তখন অশোক মাস্টারের উদ্দেশে শাপ শাপান্ত করত। অশোক মাস্টার তিনসুকিয়ার বাড়িতে সীতাকে গান শেখাতো। সে বেচারার ওপর মা'র যে কেন এত রাগ সেটা যতীন জানেনা। যতীনের শুধু খারাপ লেগেছিল, সীতাকে গান শেখানোর কাজটা হটাৎ ছেড়ে দিয়ে লোকটা একদিন নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সীতা যে অকালে মারা গেল সে সংবাদ অশোক জেনেছিল কিনা যতীন জানে না। কিন্তু ভদ্রতার খাতিরেও তো মানুষ একটা যোগাযোগ রাখে। কিন্তু অশোক রাখেনি। চমৎকার গানের গলা ছিল অশোকের। সীতাকে খুব যত্ন করে গান শেখাতো সীতা শিখেওছিল খুব ভাল। যতীনের জন্মদিনে যতীনকে চন্দন পরিয়ে দিতে দিতে সীতা ওকে গান শোনাত। মাত্র দু'বছর গান শোনাতে পেরেছিল, তারপরই হঠাৎ করে চলে গেল। আজ বহু বছর পর যতীনের জন্মদিন হচ্ছে। বোধহয় সে কারণেই বহু বছর আগের একটা দিনের কথা যতীনের মনে পড়ে যাচ্ছে। তিনসুকিয়ার কোয়ার্টার্সে শেষ শ্রাবণের এক ছলছল স্মৃতি। আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি এসেছিল বিকেলে। দিনের আলো ঢেকে গেল শ্রাবনের মেঘে। মুখর বর্ষণের মন্দিরা বেজে চলল কোয়ার্টার্সে মাথায়। সারা পিঠে কালো মেঘের মতো চুল ছড়িয়ে সীতা ঘরে এল। বয়সের চাইতে ওকে বরাবরই বেশি ভারিক্কি দেখাতো বলে যতীন ওকে ডাকত 'বুড়ি, বলে। সদা খোলের তাঁতের শাড়ি, সাদা জমিতে ছোট-ছোট লাল-বুটি আর টকটকে লালরঙের কারুকাজ করা চওড়া পাড়। ওর হাতে পেতলের রেকাবি। তাতে চন্দন আর ধান-দুর্বো রাখা সীতা ঘরে ঢুকেই হুকুম দেওয়ার ভঙ্গিতে বলত, 'দাদা, চটপট সুবোধ বালকের মতো চেয়ারে বসে থা। আমি চন্দন দিয়ে সাজাবার পর মা আশীর্বাদ

করতে আসবে।'

সীতাকে অগ্রাহ্য করার উপায় ছিল না। ওর জিভের ডগায় যেন ক্ষুর লাগানো। যতীন বসে যেত। সীতা চন্দন দিয়ে সাজাবার পর যতীন বলত, 'কই দেখি আয়নাটা, কেমন ভূত সাজালি?'

আয়না কিছুতেই দিতে না সীতা। চন্দনের থালা সরিয়ে রেখে বলত, 'একদম নড়বি না, চুপটি করে বোস, আমি তোকে একটা পেন্নাম করি।,

সীতা গড় হয়ে প্রণাম করত। পায়ে মাথা ঠেকিয়ে বলত, 'কি হল, থালা থেকে ধান দুব্বো নিয়ে আমার মাথায় দিয়ে আশীর্বাদ কর।'

পা থেকে মাথা তুলেই সোজা হাত পাততো যতীনের সামনে। বলত, 'দাও ভাই পেন্নামের খেশারত দাও।'

যতীন পয়সা জোগাড় করে কিছু একটা কিনে রাখতই। কিন্তু খুব সহজে সেটা দিতো না। শুধু একবার দেখিয়ে পকেটে রেখে দিত। সীতা জোর করে যতীনের পকেট থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইতো আর যতীন ওকে বাধা দিতো। এভবেই শেষ জন্মদিনটা কেটেছিল যতীনের।

যতীনের বুকের মধ্যে থেকে একটা ফাঁকা বাতাস বুক খালি করে ওপরে উঠে এল। চশমাটা খাপে ঢুকিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। নির্ঘাৎ উমার টেলিফোন। তিনটে বেজে গেছে দেখে বড়দাকে ফোন করছে। যতীন ফোনটা তুলল। কথা বলতে গিয়েই সে বুঝল, না উমা নয়, লতা। টেলিফোনে যতীন নিজের পরিচয়টা দিতেই লতা বলে উঠল, 'আপনি এক্ষুনি একবার চলে আসুন। ভীষণ দরকার।'

যতীন মনে মনে হোঁচট খেল। এড়িয়ে যাবার ভঙ্গি করে বলল, 'আজকে হবেনা। আজ আমি এখনই বাড়ি যাব।'

লতার গলা পড়ন্ত বেলার মতো হয়ে এল। বলল, 'আপনাকে আটকে রাখবো কোন অধিকারে। সেদিন বোন বলে ডেকেছিলেন সেই ভরসাতেই আসতে বলছি। বিশ্বাস করুন, খুব জরুরী।'

যতীন একটু ইতস্তত করে বলল, 'কাল গেলে হয়না?'

লতা এবার গলায় জেদ আর অভিমান ফুটিয়ে বলল, 'না আমার আজকেই আপনাকে দরকার। আপনার পায়ে ধরে বলছি, শুধু একটিবার আস্থন।'

লতার গলার স্বরে, তার জেদ আর অভিমানে ডোবানো কণ্ঠের মধ্যে একটা প্রবল টান ছিল। যতীন সেই টান এড়াতে পারল না। টেলিফোন ছাড়বার আগে শুধু বলল, 'যাচ্ছি।'

প্রেস থেকে বইরে বেরিয়ে তার মনে হতে লাগল, লতাকে আজকের দিনে এড়িয়ে যেতে পারলেই ভাল হতো। মেয়েটার চোখের দৃটিতে সীতা জেগে ওঠে। ওকে দেখলে সীতাকে ভোলা যায় না। আজকেয় দিনে সীতা এমনিতেই তাঁর মনের মধ্যে গোধুলির বিষণ্ণ ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে। লতাকে দেখলে সেই ছায়া গাঢ়তর হয়ে অন্ধকারের রূপ নেবে। বাস রাস্তার দিকে যেতে যেতে যতীন ঘড়ি দেখল। আধঘণ্টার মধ্যেই লতার ওখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। তিনটে না হোক চারটের মধ্যে বাড়িতে পৌছনো দরকার। যতীনের মধ্যে একটা ব্যস্ততা দেখা দেখা দিল।

গাল পেরিয়ে চাতালে এসে দাঁড়াল যতীন। চাতালের চারপাশে মেয়েদের ভিড়টা এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে। ফুলের মালাওয়ালাকে ঘিরে কয়েকটা অল্পবয়েসী মেয়ে। চাতালের একপাশে কলতলা, সেখনে দাঁড়িয়ে দাঁত মাজছিল ছ'জন মেয়ে। মেয়েরা কেউ যতীনকে লক্ষ্য করছিল কিনা যতীনসেটা টের পেল না। এই চাতালটুকু পেরোতেই যতীনের অসহ্য লাগে। যতীন ভেবেছিল লতা নিচে না হয় সিঁড়ির গোড়ায় থাকবে। কিন্তু লতাকে বাইরে কোথাও দেখা গেল না। যতীন বারান্দায় দাঁড়িয়ে বকুলের ঘরের দিকে একবার তাকাল। দরজাটা বন্ধ। যতীন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে এল। বাইরে থেকে মৃদু গলায় ডাকল 'লতা।'

দ্বিতীয়বার ডাকবার দরকার হল না। দরজাটা বোধহয় বন্ধ ছিল না। ভেতরে থেকে ভেজানো ছিল। দরজা খুলে গেল। খোলা দরজার সামনে লতা নেই, সেই আয়া মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে।

যতীনকে খুব খাতির করে এনে সোফায় বসলো। যতীন জিজ্ঞেস করল, 'লতা কোথায় ?'

মেয়েটি খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বলল, 'দিদি ভেতরে ঘরে। এখনই। আসছে।'

মেয়েটি ভেতরের ঘরে গেল এবং তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এসে বাইরে চলে গেল। দরজাটা আগের মতোই ভেজানো। ফাঁকা ঘরে যতীন মিনিট খানেক অপেক্ষা করার পরেই ঘড়ি দেখল। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে। যতীন ভেতরে ভেতরে চঞ্চল হল। লতাকে ডাকবে কিনা ভাবছিল। কিন্তু ডাকতে হলনা। লতা পাশের ঘর থেকে পর্দা সরিয়ে এই ঘরে এসে দাঁড়াল। যতীনের শরীরের মধ্যে ভূমিকম্পের মতো কাঁপন শুরু হয়ে গেছে। লতার দিকে তাকাতে গিয়েই সে বুঝল তার মাথার মধ্যে, রক্তের ধমনিতে হয়তো বা গোটা চেতনা জুড়ে এক ভয়ঙ্কর বজ্রপাত হচ্ছে। লতার পরনে সাদা খোলের তাঁতের শাড়ি। সাদা জমিতে ছোট ছোট লালবুটি আর টকটকে লালরঙের কারুকাজ করা চাওড়া পাড় শ্যাম্পুকরা চুল গোটা পিঠে ছড়ানো। লতার হাতে পেতলের রেকাবি। যতীন সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। তার সারা শরীর ঘেমে যাচ্ছে। যেন অন্তহীন এক রহস্য তার সামনে। যতীন দেখল লতা পেতলের রেকাবিটা টেবিলের ওপর রাখল। তাতে চন্দন, ফুল, ধান আর দূর্বা। যতীনের ঠোঁট কেঁপে উঠল। কথা বলতে গিয়ে বুঝল তার গলা আটকে আসছে এক দুর্বোধ্য যন্ত্রণায়। লতার দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি কে ?'

লতা হাসল। কান্নার চাইতেও করুণ সেই হাসি। ঠোঁট চেপে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'আমি। আমি তো লতা।'

যতীন পেতলের রেকাবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এসব কী ?'

লতা আগের মতোই হাসল। বলল, 'আজ আপনার জন্মদিন। তাই তো আপনাকে প্রণাম করতে ডেকেছি। নষ্ট হয়ে গিছি বলে কি প্রনামও করতে দেবেন না ?'

নও লতা আমার জন্মদিন জানে না। আমি তো মহাপুরুষ নই যে আমার জন্মদিন সবার জানা থাকবে।

লতা যতীনের চোখের সামনে থেকে নিজের মুখটাকে ঘুরিয়ে নিতে নিতে বলল, 'সবাই না জানুক, আপনার প্রেসের লোকেরা তো জানে। যদি তাদের কারুর কাছ থেকে জেনে থাকি, তাতে নিশ্চয়ই অবাক হবেন না।'

যতীন ঘরের মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, 'আমাকে মিথ্যে বুঝিও না। আমার প্রেসের কেউ জানে না কবে আমি জন্মেছি। তাছাড়া, তুমি কখনও এভাবে সাজোনা। এই সাজ-গোজ শুধু একজন সাজতো, শুধু আজকের দিনেই।'

যতীন ঘুরে দাঁড়াল। লতা পেতলের রেকাবি থেকে চন্দনের বাটি তুলে নিচ্ছে। যতীন এগিয়ে এল। চন্দনমাখা আঙুল কাঁপছিল লতার। যতীন হাতটা ধরে ফেলল। লতা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখল যতীনের চোখ তার মুখের ওপর। যতীন বলল, 'তোমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই একটা সংশয়ের কাঁটা হৃদপিণ্ডে নিয়ে আমি ঘুরছি। আমাকে আর রক্তাক্ত করো না।'

নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিল লতা। আঙুলের চন্দনটা শুকিয়ে আসছিল। সেইদিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'কী জানতে চান আপনি?'

যতীন নিজের ভেতরে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাচ্ছিল। সে কাতর গলায় বলল, 'তুমি কে? তুমি কেন সীতার মতো হয়ে যাচ্ছ?'

লতার মুখে অন্ধকার নেমে এল। ক্লান্ত আর বিষণ্ণ গলায় সে বলল, 'আমি তো কারুর মতো হতে চাইছি না। আমি যা আমি তাই। এর বেশি জেনে সুখ নেই। কাজ কি একটা কাঁটা খুলতে গিয়ে হাঁড়ি কাঠে গলা সঁপে দেওয়া।'

লতার গলা বুজে এল। লতা চোখ নামিয়ে রেখেছে। যতীন অন্ধকার নদীতে সাঁতার দিয়ে নদীর পাড় খুঁজছিল। তার সমস্ত দ্বিধা ভেসে যাচ্ছে। তীক্ষ্ণ একটা জিজ্ঞাসা তাকে বার বার এলোমেলো

করে দিতে লাগল। সে অধৈর্য গলায় বলল, 'কেন তর্ক করছো? কেন বুঝতে পারছনা আমার কষ্টটা কোথায়?'

লতার গলা এবার চাবুকের মতো শোনাল, 'সত্যি বললে কষ্টটা আরো বাড়বে! সেটা সহ্য করতে পারবেন?'

যতীন মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'কষ্ট বাড়ুক, তবু আমি সত্যি জানতে চাই।'

লতা আয়নার দিকে সরে যেতে যেতে বলল, 'সেই নিষ্ঠুর সত্যিটা যদি এই হয়ে যে, আমি লতা নই, ওটা আমার এখানকার নাম। আমার আসল নাম সীতা। সীতা ঘোষ। বাবার নাম সতীশচন্দ্র ঘোষ। মা লাবন্যময়ী ঘোষ।'

যতীন দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। যেন লতার মুখ থেকে আগুনের গোলা ছিটকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল যতীনের মুখে। লতা দেখল যতীন আস্তে আস্তে হাত সরিয়ে তাকে দেখছে। লতা গাঢ় গলায় বলল, 'আমি জানতাম এটা সহ্য করা কঠিন হবে।'

যতীন লতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বসে পড়ল। তার পা কাঁপছে। মাথার মধ্যে হাজারটা ভীমরুল পাক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে। যতীন বলল, 'সত্য সহ্য কবার অভ্যাস আমার আছে। কিন্তু এটাই সত্য কিনা সেটা জানব কেমন করে? সীতা বেনারসে মারা গেছে। মৃত্যুর চাইতে সত্য বলে তোমার কথাকে মানতে পারার প্রামাণ আমার হাতে নেই। মরা মানুষ কি কখনও ফিরে আসে?'

লতা স্থির চোখে যতীনের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার চোখ ভিজে উঠছে সে বলল, 'বিশ্বাস করার কোন দায় তো নেই।'

যতীন বলল, 'পুরোপুরি অবিশ্বাসও তো করতে পারছি না। যদি পারতাম তাহলে বেঁচে যেতাম।'

লতা সাপের ফণার মতো উদ্ধত ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তার মানে তুই এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিস না। এখনও আধখানা বিশ্বাস নিয়ে আমাকে যাচাই করছিস!'

যতীন এখন বিস্ময়ের শেষ ধাপে এসে দাঁড়িয়েছে। যেন তার নিয়তি তাকে নিয়ে এক ভয়ঙ্কর খেলায় মেতেছে। যতীন অবাক হয়ে

লতার দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বলতে পারল না।

লতার গোটা বুক পুড়ে যাচ্ছিল। আগুন চোখে যতীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার মৃত্যুটা বাবাকে সেদিন বাঁচিয়ে দিয়েছিল। বাবা হয়তো সেটাই সত্যি বলে জেনেছিলেন। কিন্তু মরণ অত সহজে আসেনা। আমার কপালে যে বিধাতা নরক ভোগ লিখেছিলেন। মরতে চাইলেও মরতে পারিনি। ওই অশোক মাস্টারের ভীরুতা আর ওর স্বার্থপরতা আমাকে মৃত্যুর কাছে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বেনারসের গঙ্গা তার বুকে আমাকে এতটুকু ঠাঁই দেয়নি। শুধু জ্ঞান হারিয়েছিলাম মাত্র।'

যতীন টানটান হয়ে বসল উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। লতা অথবা সীতা মেয়েটাকে আগুনের মতো ঘরের মধ্যে জ্বলতে দেখছে যতীন। যেন ভেতরের সমস্ত ক্ষোভ, দুঃখ আর যন্ত্রণা হঠাৎ আগ্নেয়গিরির মতো উগড়ে দিতে চাইছে।

লতা জানালার কাছে সরে গেল। যতীনের দিকে মুখ ফেরাল না। ওখানে দাঁড়িয়েই জিগ্যেস করল, 'রথীন, বীথিন আর দীপু হয়তো আমাকে চিনতে দেরি করতে পারে। হয়তো নাও চিনতে পারে। বাবা কিংবা মা-ও কি তোর মতো আধখানা বিশ্বাস নিয়ে আমাকে দেখবে?'

যতীন শান্ত গলায় বলল, বাবা-মা আর বেঁচে নেই।'

লতা জানালার গরাদ ধরে ফিরে তাকাল। যতীনকে দেখতে দেখতে বলল, 'তাহলে তো তোর আধখানা বিশ্বাসকে পুরো করার কোন উপায়ই নেই।'

যতীন ভেতরে ভেতরে কষ্ট পাচ্ছিল। সোফা থেকে উঠে জানালার কাছে এল। গাঢ় স্বরে বলল, 'তিনসুকিয়ার কথা তোমার মনে পড়ে?'

লতা মুখ বেঁকিয়ে হাসল। বলল, 'এখনও আধখানা বিশ্বাস নিয়ে কথা বলছিস। তুইতো আমাকে জীবনে কখনও 'তুমি' সম্বোধন করিস নি। আমাকে ডাকতিস 'বুড়ি' বলে। শিউপুরের চা বাগান দেখতে নিয়ে গিয়ে ফেরার পথে আমরা বৃষ্টিতে পড়লাম। বেদম

ভিজে সেইরাত্রেই আমার জ্বর এল। তুই সারা রাত কপালে জলপটি দিলি।'

মেয়েটা যেন দক্ষ ডুবুরি। যতীনের বুকের ভেতর থেকে টেনে আনছে একটার পর একটা হারানো ছবি। যতীনের মন পেণ্ডুলামের মতো দুলছে। যতীন টেবিলে রাখা পেতলের রেকাবিটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার জন্মদিনটা তিনসুকিয়ার বাড়িতেই শেষবারের মতো হয়েছিল। সেদিন সীতা একটা গান গেয়েছিল। আমার জন্মদিনে এই গানটাই সীতা গাইতো।'

জানালার দিকে মুখ রেখে লতা বলল, 'গাইতো কারণ সীতা জানতো এই গানটা তার দাদার খুব পছন্দ। এটা গেয়েই সীতা দু'বার প্রাইজ পেয়েছিল। সেদিনের গানটা আজকের লতাও জানে।'

যতীন জানালায় দাঁড়ানো লতার দিকে তাকাল। ওর পিঠে কালো চুলের ঢেউ। পাখার হাওয়ায় সেই চুল উড়ছে। লালপাড় শাড়ির আঁচল হাওয়ার টানে মধ্যে মধ্যে ফুলে উঠছে। যতীন চোখ ফেরাতে পারছে না। লতা জানালায় দাঁড়িয়ে। যতীন ওকে ডাকবে কিনা ভাবছিল। হঠাৎ একটা নাটক তৈরি করে ফেললো লতা। ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালায় হেলান দিয়ে গেয়ে উঠল, 'মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দর বেশে এসেছ, / তোমায় করি গো নমস্কার। মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ, / তোমায় করি গো নমস্কার।'

কিন্তু গানটা শেষ করতে পারল না লতা। কান্নার প্রবল ঢেউ ওর সুর ভাসিয়ে নিয়ে গেল। গলা থেকে সুর মুছে গিয়ে শুধু কান্নাটাই জেগে থাকল। দেয়ালে মুখ রেখে লতা কাঁদতে লাগল। কান্নার আবেগে ওর সারা শরীর কাঁপছে। যতীন বিমূঢ় বিস্ময়ে অসহায় চোখে লতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ডাকল, 'বুড়ি! এই বুড়ি!' তোকে একবার লিচু গাছে তুলতে গিয়ে আমি ফেলে দিয়েছিলাম। তোর মনে আছে?'

লতা কান্না চাপতে চাপতে বাঁ হাত দিয়ে চোখের জল মুছে নিয়ে বলল, 'তুই আমার ভার রাখতে পারিস নি। তারকাটার বেড়ার

ওপর পড়ে গিয়েছিলাম। কাঁচে আমার পিঠ কেটে গিয়েছিল। বিপিন ডাক্তার চারটে টিচ করেছিল আমার পিঠে। পিঠের ঘা সেরে গিয়েছিল কিন্তু দাগটা মেলায় নি।'

যতীন বলল, 'দাগটা এখনও আছে বোহয়।'

সহসা লতা ঘুরে দাঁড়াল। যেন দানবীর মতো আক্রোশে বুকের আঁচল সরিয়ে ফেলে গায়ের লাল ব্লাউজটা একটানে ফরফর করে ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে উন্মুক্ত করে খোলা পিঠটা যতীনকে দেখিয়ে বলল, 'দ্যাখ, মিলিয়ে দেখেনে তোর আধখানা বিশ্বাস এবার পূর্ণ হোক!'

কথা বলতে বলতেই দু'হাতে মুখ ঢাকল লতা। যতীন পিঠের দাগটার ওপর পরম মমতায় চোখ রাখল। তার চোখের সামনে থেকে কলকাতা সরে গেল। লতার এই ঘর মুছে গেল। রেলের সিটি তীব্র হয়ে বাজতে লাগল তার দুই কানে। আকাশে কালো ধোঁয়া ছুঁড়ে দিতে দিতে ট্রেন যাচ্ছে। লিচু গাছের ওপর থেকে শূন্যে পড়ে যাচ্ছে ফ্রকপরা একটি মেয়ে 'দাদা—' মেয়েটার অসহায় ডাক যেন মর্মভেদী আর্তনাদের মতো চরাচরের সব শব্দ ঢেকে দিয়ে সহসা থেমে গেল যতীন পাথরের মতো লতার পেছনে খোলা পিঠের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ডাকল, 'বুড়ি তুই আমাকে ক্ষমা কর।'

হঠাৎ শব্দ করে দরজা খুলে গেল। দুজনেই চোখ ফিরিয়ে দেখল দরজায় লোক।

ভূত দেখার মতো চমকে উঠে লতা দ্রুত পাশের ঘরে ছুটে গেল। লোকটা হিংস্র চোখে যতীনকে দেখতে দেখতে ঘরে এল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কদর্য গলায় ডাকল, 'লতা—।'

লোকটাকে যতীন চেনেনা। শুধু চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছিল লোকটার সঙ্গে এখন এই মুহূর্তে দাঁতাল বুনো শুওরের কোন তফাৎ নেই। লতা হেঁট মুখে ঘরে এল। লোকটা লতার দিকে তাকিয়ে আগের মতো গলায় বলল, 'দু' দিন ছিলাম না, এরই মধ্যে বাবু বসাতে আরম্ভ করেছিস।'

যতীন প্রতিবাদ করার ভঙ্গিতে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটা যতীনকে খিস্তি করল। লতা অপরাধীর মতো গলায় বলল, 'তুমি ভুল করছো, ইনি বাবু নন, ইনি আমার—'

লোকটা শুওরের মতো গর্জন করে উঠে বলল, 'তোমার নাগর। তোর মতো মাগীর ঘরে কি স্বর্গের দেবতা এসে বেদপাঠ করবে। শালী আজ তোর বেইমানী ঘোচাবো।'

লোকটা প্যান্টের চওড়া বেল্ট খুলে ফেলল। তার চোখে বন্য হিংস্রতা জ্বলছে। আদেশের গলায় ডাকল, 'এদিকে আয়।'

যতীত স্থির থাকতে পারল না। একটা অপ্রতিরোধ্য আবেগ আর আক্রোশ তাকে অন্যরকম করে তুলল। সে এগিয়ে এসে লোকটার হাত চেপে ধরে গর্জন করে উঠল, 'খবরদার। ওর গায়ে হাত দিলে আপনাকে জ্যান্ত পুতে ফেলব।'

লোকটা অবাক হওয়ার ভান করে তাকাল। তারপরেই এক ঝটকায় যতীনকে ঠেলে দিয়ে বেল্টের চাবুক চালাল। যতীন উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। লোকটা অব্যর্থ হাতে ক্লান্তিহীন ভাবে চাবুক চালাবার মতো চামড়ার বেল্টটা চালিয়ে যাচ্ছিল। লতা ছুটে এসেছিল। কিন্তু পারল না। লোকটা এক ধাক্কায় লতাকে ছিটকে ফেলে দিল ঘরের কোণে। যতীন একবারই উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল। মরীয়া হয়ে লোকটার জামার কলার দু'হাতে চেপে ধরে একটা শক্ত ঝাকুনি দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর এঁটে উঠতে পারেনি। লোকটার প্রচণ্ড ধাক্কায় সে দরজার বাইরে ছিটকে যায়। সিঁড়ির মুখে পড়েই সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

আস্তে আস্তে সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। ছিদামমুদী লেনের চারপাশে ধীরে পায়ে রাত্রি নেমে আসতে লাগল। কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতেও উমা বার বার উন্মনা হতে লাগল। তিনটের মধ্যে যে মানুষটার বাড়ি ফিরে আসার কথা সেই মানুষটা এখনও এলনা কেন? উমা সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে জয়ন্তীকে বলল, 'সেজ ক'টা বাজে রে?'

জয়ন্তী ঘড়ির দিকে চোখ রেখে বলল, 'পৌনে আটটা।'

উমা দ্রুত ওপরে উঠে এল। টেলিফোন কানে ধরে রথীন দাঁড়িয়ে ছিল। ফোনটা নামিয়ে রেখে বলল, 'দারোয়ান সেই একই কথা বলছে। বড়দা তিনটের পর প্রেস থেকে বেরিয়ে গেছে এখনও ফেরেনি।'

বীথিন ব্যস্ত পায়ে ওপরে উঠে এল। রথীনের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'কোন খবর পেলি?'

রথীন চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়ল, না।

বীথিন অস্থির ভাবে থুত্‌নীতে হাত ঘষতে ঘষতে বলল, 'কী হতে পারে? বড়দা তো কখনই এমন করে না। আজকের দিনে কোথাও যাবে বলেও তো মনে হয়না।'

রথীনকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। বীথিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি আর ভাবতে পারছি না। যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।'

বীথিন টেলিফোনের ওপর চোখ রেখে বলল, 'তুই নিচে যা। বাইরের গেস্টরা বসে আছেন ওঁদের অ্যাটেন কর।'

রথীন চলে যাচ্ছিল। জয়ন্তীর বাবা ওপরে উঠে এলেন। রথীনকে দেখে উদ্বেগের গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'যতীনের কোন খবর পেলে?'

রথীন বলল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না। কোথায় যেতে পারে।'

জয়ন্তীর বাবা ভবেশবাবু ঘরে এসে বীথিনকে দেখে বললেন, 'ও, তুমি এখানে? তুমি একবার হাসপাতালে ফোন করো তো। মেডিক্যালেই আগে কর।'

বীথিন ডায়াল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ওখানেই দেখছি।'

নিচে নিমন্ত্রিতদের খাওয়া-দাওয়ার তদারকি করছিল দীপু। ভেতরে ভেতরে একটা আশঙ্কা তাকে নাড়া দিচ্ছে। মেজদাকে দেখে এগিয়ে গেল। দীপু জিজ্ঞেস করল, কোন খবর পেলি?'

রথীন মাথা নেড়ে জানাল-না। প্যাণ্ডেলের এক কোনে পরেশবাবু বসেছিলেন। দীপু এগিয়ে গিয়ে হাতের ইশারায় পরেশবাবুকে

ডাকল। বারান্দার পাশে নিয়ে এসে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'বড়দার কি কোথাও যাবার কথা ছিল? কোন জরুরী কাজ-টাজ?'

পরেশবাবু চিন্তিত মুখে চোখ পিট পিট করতে করতে বললে, 'সে রকমতো শুনিনি। আমরা বেরোবার পরে-পরেইতো বড়বাবুর রওনা হবার কথা।'

দীপু সরে এল। বাড়িতে একটা দুঃশ্চিন্তার কালো ছায়া নেমে আসছে। দীপুর মনের মধ্যে ভয় হতে লাগল। উমা নিচে নামছিল। দীপু এগিয়ে যেতে উমা বলল, 'ছোট ঠাকুরপো হাসপাতাল, থানা সব জায়গায় ফোন করেছে। কোথাও কোন হদিশ নেই।'

দীপু দেখল ঝুমা এগিয়ে আসছে। বারান্দায়, দোতালার ঘরের সামনে থমথমে মুখে দাদারা দাঁড়িয়ে। দীপু ঝুমাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে সরে গেল। বিকেল পর্যন্ত গোটা বাড়ি জুড়ে যে আনন্দ আর কলরব ছিল সন্ধ্যের পর থেকে তার গলা টিপে ধরছিল একটা উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। এখন আস্তে আস্তে সেটা ভয়ের চেহারা নিল। উৎসবের আনন্দটা ম্লান হয়ে আসছিল ক্রমশ। খাবার জায়গা সাজানো অথচ কেউ খেতে বসতে যাচ্ছে না। একটা গাঢ় বিষণ্ণতায় সবাই ডুবে যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

দরজার সামনে একটা ট্যাকসী এসে দাঁড়াল। বাইরে থেকে চিৎকার উঠল, 'বড়দা এসে গেছেন, বড়দা এসে গেছেন।'

দোতালা থেকে বীথিন, জয়ন্তী আর উমা দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল। রথীন আর দীপু এগিয়ে গেল ট্যাকসীর সামনে। ট্যাকসীটাকে ঘিরে তখন ছোট-খাটো ভিড়। পাঞ্জাবী ড্রাইভার দরজা খুলে বাইরে এসে গেছে। ড্রাইভারের সঙ্গে চোয়াড়ে মস্তান গোছের দুটো ছেলে। ছেলে দুটো গোটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'বাড়িতে কোন ফাংশন আছে বলে মনে হচ্ছে?'

ওদের কথার উত্তর কেউ দিলনা। সবার নজর বড়দার দিকে। দরজা খুলে বড়দা নামছিল। জামা-কাপড় জলে-কাদায় ভেজা। মুখটা ফোলা। যেন গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে যতীনের।

রথীন ভিড়ের মধ্যে এগিয়ে বড়দাকে ধরল, 'একি ! কী হয়েছে তোমার ? কোন অ্যাকসিডেন্ট'

বীথিন ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল ? কোথায় পেলেন ?'

ড্রাইভার দাড়িতে হাত বুলিয়ে ছেলে দুটোকে দেখিয়ে দিয়ে বলল, ক্যায়া হুয়া হাম নেই জানতা ? বাবু সোনাগাছি সে আতা হ্যায়।'

বীথিন ড্রাইভারকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে তার জামার কলার চেপে ধরল ছেলে দুটো এগিয়ে এসে বীথিনকে ছাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'কেন ঝামেলা করছেন। আপনাদের লোক রেণ্ডীপাড়ায় গিয়ে অন্যের বাঁধা মেয়েমানুষের ঘরে ঢুকে মজা করবে তার বেলা দোষ নেই, দোষ হল ড্রাইভারের।'

ছেলে দুটো কথা শেষ করবার আগেই দীপু বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল। পাড়ার ছেলেরা দীপুকে আটকে রাখল। সম্ভবত একটা ছেলের চোয়ালে ঘুষিও চালিয়েছিল দীপু। ছেলেটা রুমাল দিয়ে চোয়ালটা চেপে ধরে বলল, 'মাগী পাড়ায়পড়ে ছিল, ভাল বুঝে পৌঁছে দিলাম তো তাই পাড়ায় পেয়ে র‍্যালা দেখাচ্ছেন—এই না হলে ভদ্দরলোক।'

ড্রাইভারও বিরক্ত গলায় ভাড়া মিটিয়ে দিতে বলল। রথীন পকেট থেকে খাবলা দিয়ে টাকা তুলে গোটা টাকাটাই ড্রাইভারের হাতে গুঁজে দিয়ে সরে গেল। ছেলে দুটো গাড়িতে উঠতে উঠতে বলতে লাগল, 'মেয়েমানুষের ঘরে ঢুকে ফুর্তি মারবে আর বলতে গেলে র‍্যালা দেখাবে—শালা এই ভদ্দরলোকদের পাছায় আলকাতরা মাখাতে হয়।'

গলির মধ্যে ঝড় তুলে দিয়ে ট্যাকসীটা চলে গেল। বাড়ির ভেতরের কোলাহল, উদ্বেগ আর আশঙ্কা সব থিতিয়ে গিয়ে গোটা বাড়িটা থমথমে হয়ে এল। যতীন নিজের ঘরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিয়েছিল। কেউ তাকে ডাকতে আসেনি। যতীন নিজেও চাইছিল না এখন, এই মুহূর্তে কেউ তার সামনে আসুক। নিজের ঘরে একা যতীন বসে থাকল। বাইরের সমস্ত শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে এল।

গলি জুড়ে রাত নামল চোরের মতো পা-টিপে টিপে। উমা দোতালার বারান্দা থেকে দেখল বড়দার ঘরে আলো নেই। রথিন আর বীথিন মুখোমুখি বসে আছে, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না। আপমানে ওদের মুখ কালো হয়ে গেছে। জয়ন্তী আস্তে আস্তে উমার পাশে এসে দাঁড়াল। গলা নামিয়ে উমাকে বলল, 'কী বিশ্রি ব্যাপার হয়ে গেল! একগাদা আত্মীয় স্বজন আর পাড়ার লোকদের সামনে! বাবা তো না খেয়েই চলে গেলেন।'

উমা বলল, 'দীপু কোথায়?'

জয়ন্তী অন্ধকার আকাশের দিকে চোখে রেখে বলল, 'ঝুমাকে পৌঁছতে গেছে?'

উমা বুঝতে পারছিল না এখন সে কী করবে, কী করা উচিত। সে ঘরে এল। রথীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বড়দা অন্ধকার ঘরে একা বসে আছেন। আমাদের ওঁর কাছে যাওয়া দরকার।'

রথীন মুখ তুলে বীথিনের দিকে তাকাল। বীথিন আস্তে আস্তে বলল, 'যেতে তো হবেই। দীপুর জন্যে অপেক্ষা করছি।'

জয়ন্তী ফিরে এল। বীথিনের কথাটা তার কানে গিয়েছে। সে বলল, 'দীপু এসে কী করবে। তোমরাই যাও, অন্তত জেনে নাও, যা শুনেছ সেটা সত্যি কিনা।'

রথীন উঠে দাঁড়াল। বিথিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আয়?'

বীথিন উঠল না। চেয়ারের হাতলে ঘুষি মেরে বলল, 'কী জিজ্ঞেস করবে? আনবিলিভেব্‌ল ব্যাপার। জিজ্ঞেস করতেই তো খারাপ লাগছে।

জয়ন্তী স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মোটেও আন-বিলিভেব্‌ল নয়। ব্যাচিলর মানুষ। তার ফিজিক্যাল একটা আর্চ থাকতেই পারে।'

বীথিন জয়ন্তীকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাকতে পারে সেটা মানছি! তাই বলে শেষ পর্যন্ত এরকম…।'

রথীন ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বলল, 'আমি ভাবতে পারছি না। মান-সম্মান সমস্ত ধুলোয় মিশে গেল। মিথ্যে হোক,

সত্যি হোক, আর তো জনে জনে গিয়ে বলে আসা সম্ভব নয় যে আপনারা যা জেনে এসেছেন সেটা মিথ্যে।'

বীথিন কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। কেষ্ট ওপরে উঠে এসেছে। বীথিন বলল, 'কিরে কেষ্ট, কী চাই?'

কেষ্ট বলল, 'ক্যাটারারের লোক জিজ্ঞেস করল তারা চলে যাবে কিনা। আর...'

কেষ্ট থেমে গেল। বীথিন বলল, 'আর কি?'

কেষ্ট আস্তে আস্তে বলল, 'বড়বাবু একটু ডেটল আর তুলো চাইছেন।'

উমা আহত চোখে ঘরের সবার দিকে তাকাল। স্বামীর মুখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'ছিঃ তোমরা খালি নিজের মানসম্মানের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। একবারও মানুষটার খোঁজ করলে না। যদি শরীরে আঘাত লেগে থাকে।'

বীথিন নিজের ব্যাগটা টেনে নিয়ে বলল, 'কেষ্ট তুই নিচে যা, আমি যাচ্ছি।'

বীথিন দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজাটা ঠেলতে একটু সময় নিল। বাইরে থেকে ডাকল, 'বড়দা।'

যতীন ভেতর থেকে উত্তর দিল, 'আয়।'

অন্ধকার ঘরে বড়দা বসে। বীথিন আলো জ্বালাল। বীথিন দেখল বড়দা এখনও জামা-কাপড় ছাড়েনি। তার চোখের দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই। পাথরের মতো চেয়ারটাতে বসে আছে। বীথিন বলল, 'তুমি ডেটল চেয়ে পাঠিয়েছ শুনে আমি দেখতে এলাম। কোথাও চোট লেগেছে?'

যতীন চেয়ার থেকে নামতে নামতে বলল, 'না, তেমন কিছু নয়।'

বীথিন দেখল বড়দার মুখটা ফোলা-ফোলা। জামায় কাদার দাগ শুকিয়ে এসেছে। হয়তো শরীরে নিশ্চয়ই কোথাও চোট লেগেছে। বীথিন বলল, 'জামাটা খুলে ফেল। আমায় একবার দেখতে দাও।'

যতীন চেয়ারের ওপর পা তুলে দিয়ে কাপড় সরিয়ে হাঁটুটা বার করে বলল, 'এখানে একটু ডেটল লাগিয়ে দে।'

হাঁটুর কাছটা বিশ্রিভাবে ছড়ে গেছে। শুকনো রক্তের দাগ জমে আছে কাটা জায়গাটার চারপাশে। বীথিন তুলো ঘষে জায়গাটা পরিষ্কার করে নিয়ে ওষুধ লাগিয়ে দিল। রথীন দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'আর কোথাও চোট লাগেনি?'

যতীন সংক্ষেপে উত্তর দিল, 'না।'

রথীন আর বীথিন দুজনে দুজনের দিকে তাকাল। বীথিনের ইশারা বুঝে নিয়ে রথীন বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা ছিল।'

যতীন চেয়ারে বসতে বসতে বলল, 'বল।'

রথীন একটু সময় নিল। দরজার বাইরে দীপু আর উমা দাঁড়িয়ে। বোধহয় জয়ন্তীও ওদের পেছনে আছে। রথীন বলল, 'ট্যাকসীওলা আর ওই দুটো ছেলে যা বলে গেল সেটা কি সত্যি।'

যতীন শুধু চোখ তুলে ম্লান চোখে ভাইদের দিকে তাকাল। ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। যতীন চোখ নামিয়ে নিল। বীথিন বলল, 'তুমি চুপ করে থেকোনা। বল ঘটনাটা সত্যি কিনা। আমরা তোমার মুখ থেকে শুনতে চাইছি, তুমি সত্যি সত্যি কোন খারাপ পাড়ায় গিয়েছিলে কিনা।'

যতীন মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'হ্যাঁ গিয়েছিলাম।'

আহত বিস্ময়ে চমকে উঠে রথীন বলল, 'ও পাড়ার কোন মেয়ের ঘরে তুমি যাও?

যতীন চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'হ্যাঁ আমি যাই, আমাকে যেতে হয়, যেতে হবে।'

নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না রথীন আর বীথিন। ওরা ক্ষোভ আর অভিমানের চোখে যতীনের দিকে তাকাল। যতীন চোখ বুঁজে আছে। বীথিন বলল, 'একথা আমাদের কাছে গোপন করেছিলে কেন?'

যতীন উত্তর দিতে পারল না। তার মন বার বার ছুটে যাচ্ছিল সীতার কাছে। ওই লোকটা সীতাকে কী করেছে সেই ভাবনাটাই তার কাছে বড় হয়ে উঠছে। সে জানে সব কথা এখনই সবাইকে বলার নয়। ওরা কেউ হয়তো সীতাকে মেনে নেবে না। ওরা

যদি সীতাকে ফিরিয়ে দেয় তাহলে মেয়েটা কোথায় যাবে? জেনে শুনে এখন আর ওকে ওই নরকে রাখতে পারবেনা যতীন।

যতীন শুনল বীথিনেরগলা বর্কশ হয়ে জানতে চাইছে, 'তোমার নিজের সুখটাই দেখলে, আমাদের মান-সম্মান, বদনাম কোন কিছুর তোয়াক্কা করলে না। সবার সামনে আমাদের উঁচু মাথাটা হেঁট করে দিলে কোন অধিকারে?'

যতীন এ কথার কোন জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করল না। বিছানার ওপর বসতে বসতে বলল, 'আমায় একটু একা থাকতে দে।'

রথীন চলে যেতে যেতে বলল, 'একা থাকতে চাও থাকো। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকতে হলে এসব কুঅভ্যাস তোমাকে ছাড়তে হবে।'

যতীন বলল, 'কী বললি?'

রথীন আগের মতোই বলল, ওই সব অভ্যাস নিয়ে এবাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। যদি ছাড়তে না পারো তাহলে আমাদেরই বাড়ি ছাড়তে হবে।'

যতীন তার বিস্মিত চোখ তুলে দেখল রথীন আর বীথিন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বীথিন যেন শুনিয়ে শুনিয়ে বলছে, 'আমার পক্ষে এ বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। আমার প্রোফেসন, ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ···

কথা বলতে বলতে বীথিন ওপরে উঠে গেল। যতীন উঠে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, তার ভাইরা দল বেঁধে উপরে উঠে যাচ্ছে। যতীন ঘরে ফিরে এল। সারা শরীরে একটা ব্যথা থেকে থেকে জেগে উঠছে। দোতলার ঘর থেকে সন্টুর গলা পেল যতীন। রথীন ওকে ধমকাছে। যতীনের বুক মুচড়ে কান্না আসছিল। ছেলেটাকেও ওরা এঘরে শুতে পাঠাচ্ছেনা। যতীন বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল এখন তার কী করা উচিত। কথাটা কি ভাইদের বলে দেবে। যদি ওরা সীতাকে আর ফিরিয়ে নিতে না চায় তাহলে সীতা কোথায় যাবে? ওকে যদি উমা আর জয়ন্তী মেনে না নেয়। যদি আত্মীয়-স্বজন ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে থাকে। যতীন মনে মনে যুদ্ধ করতে করতে ভাবল, ছিদামমুদী লেনের সংসারটা এখন আর ছোট নেই।

শুধু রথী, বীথি আর দীপুই সব নয়। ওদের শ্বশুরবাড়ি, ওদের বন্ধু বান্ধব, ওদের নিজেদের জগত, সমাজ সব আয়তনে বেড়ে গেছে। যতীনের নাগাল সব জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে না।

দরজা ঠেলে ঘরে এল কেষ্ট। কেষ্টকে দেখে যতীন অবাক হয়ে গেল। কেষ্টর হাতে ভাতের থালা। মেঝের দিকে মুখ নামিয়ে কেষ্ট বলল, 'বড়বাবু, বৌদিমণি আপনার খাবার পাঠিয়ে দিলেন।'

যতীন জিজ্ঞেস করল, 'ওরা খাবে না?'

কেষ্ট একই ভাবে জবাব দিল, 'ওনারা খেয়ে নিয়েছেন।'

যতীন কথা বলতে পারল না। ইশারায় টেবিলটা দেখিয়ে দিয়ে মুখ ফেরাল। তার বুক নিঙড়ে এই প্রথম কান্না এল।

॥ ১০ ॥

দরজা খুলে দিয়েই আয়া মেয়েটি অবাক চোখে যতীনকে দেখে সরে গেল। যতীন দরজায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, 'বুড়ি কোথায়?'

আয়া মেয়েটি আরও অবাক চোখে তাকাল। যতীন নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'লতা, লতা কোথায়?'

মেয়েটি ভেতরের ঘরের দরজা দেখিয়ে বলল, 'দিদির খুব শরীর খারাপ। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।'

যতীন ঘরের ভেতরে এসে নিজেই দরজা বন্ধ করে বলল, 'খবর দাও, আমি ভেতরে যাব।

মেয়েটি ভেতরে চলে গেল। যতীন ঘরের মধ্যে অপেক্ষা করতে লাগল। যতীনকে ভেতরে যেতে হল না। লতা নিজেই উঠে এল। ওর চেহারায় ক্লান্তি ধরা পড়ছিল। যতীনকে দেখে লতা বলল, 'তুই এলি! আমি জানতাম তুই আসবি। কিন্তু কেন এলি? এই নরকে তোকে একদম মানায় না।'

যতীন এগিয়ে গিয়ে লতার কাঁধে হাত রাখল। বলল, 'তোকেও তো মানায় না।'

লতার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। কাঁপা গলায় বলল, 'তবু তো

ম্যানিয়ে নিয়েছি। কিন্তু তুই এলি কেন?'

যতীন গাঢ়স্বরে বলল, 'তোকে নিয়ে যেতে।'

লতার চোখের তারায় আলো জ্বলে উঠল। যেন স্বপ্নের চোখে যতীনকে দেখতে দেখতে বলল, 'সত্যি! রথী, বীথি ওরা আমাকে নিয়ে যেতে তোকে পাঠিয়েছে?'

যতীন বুঝল আনন্দে কিংবা উত্তেজনায় সীতার শরীর কাঁপছে। যতীন ওকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'কেউ আমাকে পাঠায় নি। সবাইকে ছেড়ে আমি নিজেই তোর কাছে এসেছি। তোকে আমার সঙ্গে নিয়ে যাব।'

সীতা ক্লান্ত চোখ তুলে হাসল। বলল, 'কোথায় নিয়ে যাবি?'

যতীন ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে করতে বলল, 'জানিনা তবে এখানে তোকে ফেলে রাখতে পারব না।'

সীতার মুখে অন্ধকার নেমে এল। জলে ডোবা মানুষের মতো আর্ত গলায় সে বলল, 'অত সহজে আমরা এই নরকের গণ্ডি ছেড়ে যেতে পারিনা রে। আমাদের মুক্তি অনেক ঝামেলার ব্যাপার।'

যতীন চোয়াল শক্ত করে দৃঢ় গলায় বলল. কোন ঝামেলাকেই আমি পরোয়া করি না আসার আগে আমি পানুর সঙ্গে কথা বলেছি। হাজার পাঁচেক টাকা ওকে দিলে সব ঝামেলা পানুই মিটিয়ে দেবে। যদি তাতে না হয় তাহলে আমি পুলিশের কাছে যাব। কোর্টে যাব।'

সীতা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমাকে নিয়ে তুই কী করবি দাদা, আমি যে নষ্ট হয়ে গেছি।'

যতীন সোফায় বসতে বসতে বলল, 'মানুষ কখন নষ্ট হয় না। ইচ্ছে করলে এখান থেকেই আবার জীবন শুরু করা যায়।'

সীতা যতীনের কাছে এগিয়ে এল। হাটু মুড়ে যতীনের পায়ের কাছে বসতে বসতে বলল, 'তুই বাড়িতে বলেছিস আমার কথা?'

যতীন চুপ করে রইল। সীতা যতীনের হাঁটুর ওপর মাথা রাখতে রাখতে বলল, 'রথী, বীথি ওরা আমাকে ছিদামমুদি লেনের বাড়িতে জায়গা দেবে?

যতীন উত্তর দিল না। সীতা আস্তে আস্তে মাথা তুলল। যতীনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেউ যখন এল না, তখন তুই কেন মরতে এলি এখানে? তুই চলে যা। সবাইকে ছেড়ে শুধু আমাকে নিয়ে বেঁচে থাকার মধ্যে তোর কোন গৌরব নেই, বরং অনেক অনেক বেশি কলঙ্ক আছে।'

যতীন সীতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'বুড়ি, আজ আর কোন জেদ করিসনা। সব জেনেও তোকে এখানে ফেলে রাখাতেই আমার কলঙ্ক বেশি। শুনলে হয়তো তুই কষ্ট পাবি, তবু তোকে জানানো দরকার, ছিদামমুদি লেনের বাড়িতে তোর কোন জায়গা হবেনা। রথী, বীথি, ওরা সমাজের প্রতিষ্ঠিত ভদ্রলোক। ওরা নিজেদের সম্মানের কথা ভেবে তোকে হয়তো জায়গা দেবেনা। তাই আমি ওদের সবাইকে ছেড়ে তোর কাছে এসেছি। তুই আমাকে ফিরিয়ে দিস না।

সীতার চোখ ছাপিয়ে কান্না নেমে এল। যতীন পকেট থেকে লাল ন্যাকড়ায় জড়ানো বালা দুটো বার করে সীতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এটা আমার কাছেই ছিল। আসবার সময় নিয়ে এসেছি। তুই চিনতে পারিস?'

সীতা বালা দুটো দেখতে দেখতে বলল, 'ভুলবো কেমন করে! বাবাকে চিঠি লিখে যখন মরতে গিয়েছিলাম তখন চিঠির ওপর এই দুটো আমি খুলে রেখে গিয়েছিলাম।'

যতীন বালা জোড়া সীতার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'এবার এটা তুই পর। কিন্তু তুই মরতে গিয়েছিলি কেন?'

সীতা বিস্মিত চোখে যতীনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুই আজও জানিস না?'

যতীন ঘাড় নাড়ল। সীতা উঠে দাঁড়াল। দেওয়ালের দিকে সরে যেতে যেতে বলল, 'বাবা কিংবা মা কেউ তোকে বলেনি? মা মরবার আগেও তোকে বলে যায়নি?

যতীন বলল, 'কেউই কিছু বলে যায় নি। শুধু একবার মা বলেছিলো, যদি সীতা কখনও ফিরে আসে, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম,

মরা মানুষ ফিরে আসবে কেমন করে।'

সীতা করুণ করে হাসল। যেন কাঁদতে গিয়ে ভুল করে হেসে ফেলেছে। ঘরের পর্দা ধার কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর বলল, 'আশোকদাকে তোর মনে আছে?'

যতীন ঘাড় নেড়ে বলল, 'আছে।'

লতা দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে হাহাকার ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওই ভীরু, কাপুরুষ লোকটাকে হঠাৎ কেন যে ভালবেসে ফেলেছিলাম তা জানি না। ভেবেছিলাম ওর ওপর নির্ভর করা যায়। লোকটার আবেগের কাছে ভেসে যেতাম। আমার তখন সেই ভয়ঙ্কর বয়স। শরীরের খোপে খোপে তখন স্বপ্ন। লোকটা বুঝি জাদু জানতো। সেই জাদুতে আমাকে বশ করে ফেলল। কয়েকমাস পরই বুঝলাম আমার শরীরে কোথাও একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে। মা'র কাছে ধরা পড়লাম। তখন অশোকদা ছাড়া আমাকে বাঁচাবার কেউ নেই। লোকটা সব শুনল আর শোনার পরেই তিনসুকিয়া ছেড়ে পালাল।'

যতীন ঘেমে উঠছিল। সীতার মুখ পর্দার দিকে ফেরানো। বোধহয় যতীনের দিকে তাকাতে চাইছে না সীতা। যতীন দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নিচু করল। সীতা পর্দার কাপড় দু'হাতে টেনে ধরে শুকনো গলায় বলতে লাগল, 'তিনসুকিয়ার বাড়িতে আমাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিল। লোকের কাছে ধরা পড়ার ভয়ে বাবা কাজের অছিলায় আমাকে নিয়ে বেনারসে এলেন। ভেবেছিলেন এখানে এসে কিছু একটা ব্যবস্থা করবেন। উঠলেন এসে বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে দিন কয়েকের বেশি থাকা গেলনা। বন্ধুর স্ত্রী, মানে যাকে মাসিমা বলতাম, তিনি ধরে ফেললেন। চলে এলাম ধর্মশালায়। সেখানেও ধরা পড়ে গেলাম। আমার পেটের পাপ তখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাবা বোধহয় দু'একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। দেরি হয়ে গেছে বলে তারা কেউ দায়িত্ব নিলনা। ধর্মশালার মালিক যেদিন বাবাকে চলে যাবার নোটিশ দিলেন সেদিন রাতে আমি বিছানায় বসে কাঁদছিলাম। বাবা ঘরের মধ্যে পাগলের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলছিলেন, 'এখন আর কেঁদে কী হবে। যমেরও অরুচি

নীলকণ্ঠ—৮

তুই। এখন যে কোথায় যাবো, কী করব কিছুই বুঝতে পারছি না। এক হয় তুই গঙ্গাও ডুবে মর, না হয় আমি মরি।' বাবাই পথ দেখিয়ে দিলেন। সেই রাত্রেই চিঠি লিখে বেরিয়ে এলাম। তুই বিশ্বাস কর, মরবো বলেই সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম। অন্ধকার গঙ্গার পাড়ে দাঁড়িয়ে সেদিন মৃত্যুকেই মুক্তি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু মুক্তি মিলল না। ঝাঁপ দিলাম, কিন্তু মরলাম না। এই পাপের শরীরটাকে গঙ্গা সেদিন ঠাঁই দিল না। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম আমি খাটের ওপর শুয়ে আছে হীরের নাকছাবি পরে একজন মহিলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি বাঁচলাম কিন্তু পেটের ওটা বাঁচল না। হাসপাতালে এক নাগাড়ে মাসখানেক থাকতে হয়েছিল। যিনি সেদিন আমাকে গঙ্গা থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন সেই বাইজী-কে সব বললাম। তিনসুকিয়ার ঠিকানা দিলাম। ওরা সত্যিই কোন যোগাযোগ করেছিল কিনা জানিনা। কিছুদিন পর আমাকে জানালো' বাবা তিনসুকিয়াতে নেই। ওরা নাকি কোথও আমার বাবাকে খুঁজে পায়নি। আর তোরাও আমাকে খোঁজবার চেষ্টা করিস নি। তাই একদিন রাগে, দুঃখে, বাবার ওপর, মা'র ওপর, ওই বেইমান অশোকটার ওপর, তোদের সবার অপর রেগে আমি মাসির কাছে আত্মসমর্পন করলাম। নতুন করে মরলাম। মাসি বেশ কিছুদিন পর চড়া দামে আমাকে পাচার করল কলকাতায়। বাঁধাবাবুর কাছে বাঁধা হয়ে গেলাম।'

সীতার গলার স্বরে শেষের দিকে যে আক্রোশ আর অভিমান ছিল এখন সেটা হাহাকারের মতো আর্তনাদ হয়ে উঠল। পর্দার কাপড়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে সীতা দরজার ওপর লুটিয়ে পড়ল।

যতীন এগিয়ে এসে সীতার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিতে নিতে বলল, 'চল বুড়ি, আমরা আবার বেনারসে যাই। যেখানে তুই মরতে গিয়েছিলি সেখানে থেকেই এবার নতুন করে বাঁচতে আরম্ভ কর।'

সীতা দাদার বুকে মাথা গুঁজে দিল। কান্নায় তার গলা বুজে আসছিল। বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে বলল, 'বড্ড দেরি হয়ে গেছেরে,

বড্ড দেরি হয়ে গেছে। যেদিন মরতে চেয়েছিলাম সেদিন মরিনি। আজ তোকে পেয়ে আমার বাঁচতে ইচ্ছে করছে' ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে।'

যতীন সীতার গাল থেকে কান্না মুছিয়ে দিয়ে বলল, 'তোকে বাঁচাতেই তো সব ছেড়ে এসেছি। এবার তুই বাঁচ।'

সীতার বুকের ভেতর থেকে কান্নাটা এবার প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মতো ধেয়ে এল। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বলল, 'পারবি না দাদা, তুই পারবি না। বড্ড দেরি করে ফেলেছিস। আমার তলপেটে এখন ক্যানসার।'

যতীন চিৎকার করে উঠতে গিয়ে থেমে গেল। পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে থাকল খানিকক্ষণ। তারপর আস্তে আস্তে উঠে জানালায় এল। বাইরে সূর্যের অটল আক্রোশ শহরটাকে নিঃশব্দে পুড়িয়ে দিচ্ছে। কাছে কিংবা দূরে কোন কোলাহল নেই। যেন মধ্যরাতের নির্জনতা আর নৈঃশব্দ নিয়ে একটা দুপুর দৈত্যের মতো জেগে আছে। যতীন ধপ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল।

॥ ১১ ॥

বেনারসের আকাশ কাঁপিয়ে বৃষ্টি এল। জানালায় দাঁড়িয়ে যতীন দেখল বৃষ্টির জন্যে দূরের সব দৃশ্য ঝাপসা হয়ে গেছে। সীতা বিছানায় তখনও জেগে। ওর পাণ্ডুর মুখে যন্ত্রণার চিহ্ন লেগে আছে তবু যতীন চোখ ফেরাতেই সীতা হাসল। বলল, 'দাদা, কাল দশমী তাই না?'

যতীন বলল, 'হ্যাঁ।'

সীতা আস্তে আস্তে উঠে বসল। বলল, 'নিজের ওপর আমার বিশ্বাস নেই। যদি কাল পর্যন্ত না বাঁচি তাই আজকেই তোকে বিজয়ার প্রণামটা করে নিই। তুই একটু এগিয়ে আয়।,

যতীন এগিয়ে এল। তার বুকের মধ্যে একটা অন্তহীন শূন্যতা। সে জানে কলকাতার ডাক্তাররা যখন পারেনি তখন বেনারসের ডাক্তাররাও পারবে না। তবু সেই বেনারসেই আসতে হল। সীতার

বড় শখ জীবনের শেষ মুহূর্তটা যেন বেনারসেই কাটে। যেখান থেকে মৃত্যু তাকে একদিন ফিরিয়ে দিয়েছিল সেখানেই সে মরতে চায়। অন্তত জীবনে একবারে সে জেনে যেতে চায় সে জয়ী হয়েছে। যতীন সামনে এসে দাঁড়াল। সীতা পায়ে মাথা রেখে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে থাকলো। তারপর মাথা তুলতে তুলতে বলল, 'ক'দিন থেকে কেন জানি না, হয়তো তোর মুখ থেকে গল্প শুনে শুনে আমার ভীষণ লোভ হচ্ছে বেঁচে থাকবার। রথী, বীথি, দীপু ওদের দেখতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে। হ্যাঁরে, দীপুর বৌ ঝুমা খুব ভাল দেখতে হবে তাই নারে?'

যতীন মুখ ফিরিয়ে নিল। জানালার বাইরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। সেই দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সে বলল, 'তাতে তোর কি!'

সীতা হাসল। হেসে ফেলে বলল, 'তুই মিথ্যে রাগ করছিস ওদের ওপর। তোকে তো ওরা ছাড়তে চাইনি। তুই আমার জন্যে ওদের ছেড়ে এসেছিস। তুই যদি আমার কথা ওদের বলতিস তাহলেও কি ওরা আমাকে একটিবার দেখতে আসতো না?'

যতীন সীতার দিকে না তাকিয়ে বলল, 'আমি টাকার জন্যে প্রেসের ম্যানেজারের কাছে চিঠি দিয়েছি। রথীর কাছেও সব জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছি। দেখি কী হয়।'

সীতা বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বলল, 'যদি ওরা আসার আগে আমি মরে যাই তাহলে আমার হয়ে তুই বলে দিস, আমি ওদের ওপর রাগ করিনি। আমার বড় সাধ, শুধু ওদের দেখবার। আমি ওদের বড়দাকে ওদের কাছ থেকে কেড়ে নিই নি। আমি চলে গেলে ওরা যেন তোকে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আমার যে এখন তোকে নিয়ে ভাবনা।'

যতীন চোখ ফিরিয়ে আনল। ঘরের মধ্যে যন্ত্রণায় সীতার শরীর কুঁকড়ে আসছিল। যতীন ওর কপালে হাত রেখে ডাকল, 'বুড়ি আমি আছি তোর ভয় নেই।

সীতা চোখ বুজল। তার চোখের সামনে তিনসুকিয়ার কোয়ার্টার্স ভেসে উঠল। একটা দোলনা দুলছে। যতীন দোলনাটা দুলিয়ে দিয়ে দূরে সরে গেল। দোলনাটা অনেকটা ওপরে উঠে গিয়ে দুলতে

ছুলতে নিচে নেমে এল। কাঁপতে কাঁপতে দোলানাটা সহসা থেমে গেল। সীতার বন্ধ চোখের অন্ধকার থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে এল।

যতীন কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ডাকল, 'বুড়ি, এই বুড়ি।'

ভেজা চোখ মেলে সীতা তাকাল। যতীনের মুখটা ঝাপসা দেখাচ্ছে। সীতা বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারল না। আস্তে আস্তে তার চোখ বুজে এল। তার বন্ধ চোখের কোল জুড়ে মন্থর মেঘের মতো ভেসে আসতে লাগল হারানো দিনের ছবি। তিনসুকিয়ার কোয়ার্টার্সের বারান্দায় খালি গায়ে পড়তে বসেছে রথী। পেয়ারাতলায় দীপুকে কোলে নিয়ে সিতা ঘুম পাড়াচ্ছে। ঘরের ভেতর থেকে ছুটে এল বাপি। চোখ মেলে চাইতে কষ্ট হচ্ছিল সীতার। তবু সে চোখ খুলল। যতীন তাকিয়ে আছে তার দিকে। সীতার বুকের মধ্যে এক একটা ঢেউ ভেঙে পড়ছে।

যতীন আবার ডাকল 'বুড়ি!'

সীতা বাঁ হাত তুলে নিজের মুখ ঢাকল। বলল, 'লোভে পড়ে বড় ভুল করে ফেলেছি দাদা।'

যতীন সীতার মুখের কাছে মাথা নামিয়ে এনে বলল, 'কিসের ভুল?

সীতা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তোকে চিনতে পেরে আর লোভ সামলাতে পারি নি। একবার ভেবেছিলাম, বলব না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারি নি। এখন আমাকে নিয়ে তোর বিপদটা বোঝ। না পারছিস ফেলতে, না পারছিস ভাইদের সংসারে জায়গা দিতে।'

যতীন উঠে দাঁড়াল। জানালার দিকে সরে যেতে যেতে বলল, 'ওসব কথা থাক। তুই ঘুমো।'

সীতা পাশ ফিরে শুয়ে যতীনকে দেখতে দেখতে বলল, 'বাবা অনেক কষ্টে সংসার গড়ে ছিলেন। সেই সংসারে এখন সুখের বান ডাকছে। ওঁরা কেউ দেখে যেতে পারেন নি। কিন্তু আমার কেন দেখতে এত সাধ হচ্ছেরে দাদা? আমার ভাইরা কেউ অফিসার কেউ ডাক্তার আর আমি···

সীতা কথা শেষ করতে পারল না। যতীন দেখল বালিশে মুখ

গুঁজে সীতে কান্না থামচ্ছে। ওর সারা শরীর জুরে কান্নার কাঁপন। যতীন জানালার কাছ থেকে সরে এসে সীতার মাথার কাছে বসল। সীতা চেষ্টা করল কিন্তু ঝাপসা চোখে যতীনকে ভাল করে দেখতে পেলনা। সে শুধু দেখতে পেল মাঝ চৈত্রের দামাল হাওয়ায় তিন-সুকিয়ার কোয়াটার্সের গাছ-পালা কাঁপছে, উড়ে আসছে শুকনো পাতা আর ধুলোর ঘুর্ণি। আকাশ কালো করে দিয়ে একটা ইঞ্জিন ধোঁয়া ঝাড়তে ছাড়তে চলে গেল। সীতা মরীয়া হয়ে আরেকবার যতীনকে দেখতে চাইল, কিন্তু পারল না। তাব চোখ অন্ধকারে ঢেকে গেছে। সীতা চোখ বুজল।

যতীন সীতার কপালে হাত রাখল। আস্তে আস্তে উঠে গেল বারান্দায়। নবমীর রাত ফুরিয়ে আসছে। ঘোলাটে আকাশে আজ আর কোন তারা ফোটেনি। বৃষ্টি থেমে গেছে খানিক আগে। যতীন আবার ঘবে এল। তার বুকের ভেতরটা পাথর হয়ে আসছে। সীতার গায়ের চাদরটা তুলে ওকে ঢেকে দিতে গিয়ে টের পেল তার সারা শরীর কাঁপছে। যতীন থেমে গেল। সীতা একবার শিউপরের চা-বাগান দেখতে চেয়েছিল। কথা রেখেছিল যতীন। সীতা শুধু একটি বারের জন্য ছিদামমুদী লেনের সাজানো সংসারটা দেখতে চেয়েছিল। বড় দুর্লভ এই চাওয়া। যতীন দেখাতে পাবেনি।

যতীন দরজাটা ভেজিয়ে দিল। বাইরের জানালা দিয়ে বৃষ্টি ভেজে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। দূর থেকে ভেসে আসছে ঢাকের বাদ্যি। যতীনের মনে পড়ল কোলকাতাকে। ছিদামমুদী লেনের বাড়িটা বোধ হয় এখন ঘুমিয়ে। যতীন চোখ ফেরাল। সীতার মুখে এখন আর কোন যন্ত্রণা নেই। যতীন আস্তে আস্তে চেয়ারটা টেনে আনল সীতার মাথার কছে। চেয়ারে বসে সীতার দিকে তাকাতে গিয়ে বুকের ভেতর থেকে চেয়ারের সামনে উঠে এল সেই সব আশ্চর্য দৃশ্য মালা। পেয়ারা গাছের সঙ্গে ঝোলানো দোলনায় দীপুকে কোলে নিয়ে দোল খাচ্ছে সীতা। রথী আর বীথি দোলনাটা দুলিয়ে দিচ্ছে। মশারীর মধ্যে কোলের ওপর শুইয়ে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াচ্ছে দীপুকে। অশোক মাস্টার স্কুলের মাঠে সীতাকে নিয়ে

হেঁটে যাচ্ছে গান তোলবার জন্যে। ঘরের মধ্যে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে সেই গান। কাঁধের ওপর দুটো বিনুনী ঝুলিয়ে সীতা দৌড়ে আসছে কোয়ার্টার্সের দিকে। ওর হাতে ব্রোঞ্জের সরস্বতী। যতীনের হাতে ওটা তুলে দিয়ে সীতা বলে উঠল, 'আমি ফার্স্ট হয়েছি দাদা এই ছাখ প্রাইজ।'

যতীন আর দেখতে পারল না। দু'হাতে মুখ ঢেকে সে উঠে গেল জানালার কাছে। মেঘলা আকাশের দিকে চোখ রাখতে গিয়ে সে ধরতে পারল তার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসছে।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে ওরা তিনজন বড়দার দিকে তাকাল। বড়দার মুখে কোন ভাবান্তর নেই। পর্বতের মতো অটল তার মুখ। সে শুধু বলল, 'না, তোদের দোষ নেই, তোরা দেরি করিস নি, ওই আর অপেক্ষা করতে পারল না।'

দীপু হাঁটু মুড়ে খাটের কাছে বসল। রথীন আর বীথিন স্থির চোখে তাকিয়েছিল সীতার দিকে। যতীন বারান্দায় এসে দাঁড়াল। দীপু এসে দাঁড়িয়েছে পেছনে। যতীন ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'কিছু বলবি ?'
দীপু শুধু মাথা নাড়ল। জবাব দিতে পারল না। যতীন বলল, 'বল।'

দীপু বড়দার হাতটা ধরে বলল, 'খুব ছোট বয়সে মা মারা গিয়েছিল? ভাল করে বাবাকে মনে পড়ে না। তুমি আমাদের সব, তুমি কেন সব জেনেও না জানিয়ে চলে এলে ?'

যতীন হাসল। হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'জানাবার সুযোগ পেলাম কোথায়। তাছাড়া জানালে অনেক সমস্যা হতো। ওর জন্যে তোদের সম্মান বাড়ত না।'

দীপু অপরাধীর মতো মাথা নিচু করল। যতীন চলে যাচ্ছিল। দীপু পেছন পেছন এল। বলল, 'কোথায় যাচ্ছ ?'

যতীন বলল, 'এখন বসে থাকার সময় নেই। অনেক কাজ রয়েছে।'

দীপু থমথমে গলায় বলল, সে কাজ তো আমাদেরও। এবার আমাদের কিছু করতে দাও।'

যতীন বলল, 'কী করবি?'

দীপু গলার কাছে উঠে আসা যন্ত্রণাটাকে চাপতে চাপতে বলল, 'বড়দি তো মায়ের মতো। এসময় মায়ের কাজে ছেলেরা যা করে।'

যতীন চোখ তুলে তাকাল। দীপু ততক্ষণে মুখ নামিয়ে ফেলেছে। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সীতাকে মনে পড়ল যতীনের। যতীন মনে মনে বলল, 'বুড়ি, কষ্ট করে আর একটা দিন থেকে গেলে পারতিস। খানিকটা ভালবাসা পেয়ে মরতে পারায় অনেক সুখ।'

দীপু মুখাগ্নি করে বড়দার পাশে এসে দাঁড়াল। যতীনের চোখে জল নেই। সে স্থির চোখে চিতার দিকে তাকিয়ে ছিল। বেনারসের গঙ্গা থেকে বিসর্জনের বাজনা ভেসে আসছে। দশমীর চাঁদ ঢেকে আছে মেঘে। আকাশ জুড়ে দালাপাকানো মেঘের জঙ্গল। যতীন আস্তে আস্তে চিতার দিকে এগিয়ে গেল। সীতার মুখের ওপর শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়েছে। যতীন পাতাটা সরিয়ে দিল। সীতার কপালে হাত রেখে দু'দণ্ড স্থির হয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে সরে গেল ঘাটের কাছে। রথীন দেখল, বড়দা গঙ্গার দিকে চোখ রেখে হেঁটে যাচ্ছে।

বীথিন বড়দার কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'বড়দা, দিদির হাতে সোনার বালা জোড়া থেকে গেছে।'

যতীন গঙ্গার দিকে চোখ রেখে বলল, 'থাক!'

রথীন অসহায় চোখে বীথিনের দিকে তাকাল। যতীন গঙ্গার ধারে ঘাটের ওপর দাঁড়িয়ে থাকল। মন্দিরের চূড়ায় আলো জ্বলছে। গঙ্গার পাড় জুড়ে তখনও বিসর্জনের বাজনা বেজে যাচ্ছিল।

সমাপ্ত